একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

১৮৪৭ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩২। খৃঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮২। কলিগতাব্দ ৫০২৬।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

একবিংশকল্প তৃতীয় ভাগ।

১৮৪৭ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৮১ সংখ্যা ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

৫২। অঞ্জলি—বিশ্বেশ্বর দেবতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। হে পরমেশ! তুমিই আমাদের প্রকৃত আদর্শ। তোমাকেই নয়নের সম্মুখে রাখিয়া যেন তোমারই প্রদর্শিত পথে চলি। তোমার মঙ্গলপথে চলিয়া যেন ক্রমশ তোমারই সন্নিহিত হইতে থাকি।

২। আমরা জানি, হে দয়াময়! তোমাকে ছাড়িয়া আমাদের আর অন্য গতি নাই। আমরা যেন তোমা হইতে দূরে সরিয়া না যাই। তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহারও চরণে যেন তোমার প্রাপ্য পূজা অর্পণ না করি।

৩। হে করুণাময়! তোমার শাসনে সূর্য্যচন্দ্র দ্যুলোকভূলোক অবিরোধে শূন্যে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তোমারই শাসনে দিনরাত্রি, পক্ষমাস, ঋতুসম্বৎসর সকলেই স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চলিতেছে। এই সকলের ভিতর তোমার অতুলনীয় শক্তির পরিচয় পাইতেছি।

৪। তোমার প্রসাদে পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী নদী-সকল ধরণীকে শস্যশ্যামল করিতেছে। সেই সমস্ত শস্যের দ্বারা কোটী কোটী জীবজন্তু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তোমার প্রসাদে আমরা পিতামাতার স্নেহযত্নে লালিতপালিত হইতেছি। তোমারই প্রসাদে আমরা স্ত্রীপুত্র ভাইভগ্নী প্রভৃতির স্নেহপ্রীতি নিত্য নূতনভাবে লাভ করিতেছি। এই সকলের ভিতর দিয়া তোমার অনুপম স্নেহ আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি।

৫। তুমিই আমাদিগকে সুখশান্তি নিত্য প্রদান করিতেছ। তোমাকে ছাড়িয়া আর কোন্ দেবতাকে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতিভক্তি সমর্পণ করিব?

৬। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই। আমরাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি। তুমি আমাদের কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাক, তুমি সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাক।

৭। আমরা দুর্ব্বল ভ্রান্ত জীব। হে শুভ-বুদ্ধিদাতা! তুমিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর। তুমি আমাদের অন্তরে নিয়তই জ্ঞান প্রেরণ করিতেছ। তোমারই প্রসাদে তোমাকে জানিয়া কৃতার্থ হইতেছি। করুণানিধান! তুমি এদেশ হইতে মূর্ত্তিপূজার মোহপাশ, যাগযজ্ঞের বৃথা আড়ম্বর বিদূরিত কর এবং তোমাকে জানিবার সরল পথ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও।

৫৩। অঞ্জলি—দয়াময় দেবতা।

১। হে করুণানিধান! তুমি আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি দাও, যাহাতে আমরা পবিত্র থাকিয়া সমুদয় কর্ম্ম তোমারই চরণে সমর্পণ করিয়া নির্ভয় থাকিতে পারি এবং চিরদিন তোমারই নাম কীর্ত্তন করিয়া অন্তকালে তোমাকেই লাভ করিতে পারি।

২। আজিকার মত প্রতিদিন যেন প্রাতঃ-

সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমারই নাম উচ্চারণ করিয়া গাত্রোত্থান করি, এবং জীবনের শেষ-দিনেও যেন তোমারই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তোমারই সুশীতল ক্রোড়ের আশ্রয় লাভ করি।

৩। হে রুদ্রদেব! তুমি সমুদয় বাধাবিঘ্ন, সমুদয় অসৎ বস্তু তোমার বজ্র দ্বারা বিচূর্ণ করিয়া দাও। মঙ্গল্যদেব! আমাদের মস্তকে তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

৪। হে প্রেমময়! তোমার প্রেমরূপ আমার আত্মার সম্মুখে সর্ব্বদা প্রকাশিত রাখ। আমাদের আত্মা তোমার সহিত প্রেমবন্ধনে সম্বদ্ধ হউক।

৫। হে পরমাত্মন্! আমরা নিতান্ত অবোধ। আমরা জানি না, তোমাকে কিরূপে ডাকিতে হয়। আমরা জানি না, কেমন করিয়া তোমাকে আহ্বান করিলে, তোমার মধুময় নাম কেমন করিয়া উচ্চারণ করিলে আমাদের তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে, মলিন আত্মা পবিত্র হইবে। তুমিই আমা-দিগকে তাহা শিক্ষা দাও।

৬। তুমি স্বয়ং আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও। আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তোমার কিছুই জানিতে পারি না। তুমি আমাদের সম্মুখে আবি-র্ভূত হইয়া, তুমি আমাদের শিক্ষাগুরু হইয়া আমাদের জ্ঞানকে উন্নত কর, প্রীতিকে উজ্জ্বল কর।

৭। তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব? তুমি আমাদের সকল শুভ কামনাই পূর্ণ করিতেছ। তুমি মাতার ন্যায় আমাদিগকে বিপথ হইতে সর্ব্ব-দাই রক্ষা করিতেছ। আমাদিগকে রিক্তহস্তে ফিরিতে দিও না। আমাদের প্রতিগৃহে তোমার নাম ধ্বনিত হউক। ভারতের মুখশ্রী আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

৮। হে অনাথের নাথ! আমরা সকল বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। কেবল এক ধর্ম্মের বলই আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ভাবিয়া আকুল হইতেছি যে, সেই ধর্ম্মবলও ক্রমশ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত। তুমিই আমাদের জননী। তুমিই আমাদিগকে রক্ষা কর।

৯। আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের নামে মিথ্যা যেন কিছুমাত্র প্রশ্রয় না পায়। হে বুদ্ধিদাতা! হে বলদাতা! তুমি আমাদের হৃদয়ে এমন বুদ্ধি ও শক্তি প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা যথার্থই ধর্ম্মের বলে বলীয়ান হই। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই। তুমি আমাদের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

৫৪। অঞ্জলি—রসস্বরূপ দেবতা।

১। হে পরমাত্মন্! দয়া করিয়া আমাদের অপরাধ সকল মার্জ্জনা কর। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই। আমরাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

২। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যেমন তোমার আশ্রয়ে অনুক্ষণ রহিয়াছেন, আমরাও যেন সেইরূপ অনুক্ষণ তোমারই আশ্রয়ে থাকিতে পাই।

৩। অধর্ম্ম করিবার সময় যেন আমাদের মস্তকের উপরে তোমার উদ্যত বজ্র সর্ব্বদা দেখিতে পাই। পুণ্য কর্ম্ম করিবার সময় যেন আমাদের সম্মুখে তোমার প্রসন্ন মুখ উপস্থিত থাকিয়া আমা-দিগকে উৎসাহিত করে।

৪। আমরা যাহাতে শুভাশুভ বিচার করিতে বিশেষরূপে সক্ষম হই, এরূপ বুদ্ধিশক্তি প্রেরণ কর।

৫। তোমার স্বরূপ যেন আমার চিরন্তন ধ্যানের বিষয় হয়। তুমিই জগতপ্রসারিতা পরম-দেবতা।

৬। তুমিই আনন্দস্বরূপ। তোমা হইতেই এই বিশ্বচরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয়কালে তোমাতেই প্রবেশ করিবে।

৭। তুমিই রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। তোমাকে পাইয়াই জীব আনন্দ লাভ করে। তোমাকে পাইয়া আমরাও যেন চিরকাল আনন্দিত থাকি। হে পরম মাতা! আমাদের মস্তকে তুমি এই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

৫৫। অঞ্জলি—নবজীবনদাতা দেবতা।

১। হে পরব্রহ্ম! তোমার নামে আজ আমাদিগকে নবোৎসাহে উৎসাহিত কর, নববলে বলীয়ান কর।

২। আমাদের আত্মা মৃতপ্রায় ও অসাড় হইয়া গিয়াছে। তুমি তাহাকে তোমার আনন্দরসে সিক্ত করিয়া নবজীবনে সঞ্জীবিত কর। শুষ্ক বৃক্ষ যেমন পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয় না, সেইরূপ আমাদের শুষ্ক আত্মাও তোমার অমৃতবারিতে সিক্ত না হইলে বিকসিত হইতে চাহিতেছে না।

৩। হে দেবদেব! আমাদের হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দাও, আত্মাকে উন্নত করিয়া দাও। হে আনন্দস্বরূপ! আমাদের আত্মা যেন তোমার সহবাসজনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়।

৪। আমাদের শরীরে বল দাও, মনেতে উৎসাহ দাও, আত্মাতে শক্তি দাও, যাহাতে তোমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম দেশে দেশে নগরে-নগরে, গৃহে-গৃহে প্রচার করিয়া জগতে এক সুদৃঢ়ভিত্তি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হই।

৫। চন্দ্রতপন অহরহ তোমার আরতি করিতেছে। ভূলোক দ্যুলোক অহরহ তোমার চরণবন্দনা করিতেছে। আমাদেরও প্রতি গৃহ হইতে তোমার আরতিগীত সমুত্থিত হউক।

৬। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, আমাদের প্রতি বিমুখ হইও না। আমরা সংসারমোহ ও স্বকৃত পাপে মুগ্ধ হইয়া তোমা হইতে দূরে থাকিতে চাহি বটে; কিন্তু হে ধ্রুবজ্যোতি ব্রহ্ম! তুমি আমাদের সেই মোহ সেই পাপ তোমার জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে তোমার সহবাসের উপযুক্ত কর। লয়ে যাও জননী মৃত্যু হতে অমৃত।

৭। তোমার প্রসন্ন মুখ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ কর। তোমাকে ছাড়িয়া এ সংসারে পরিত্রাণ নাই, মুক্তি নাই। হে স্বপ্রকাশ! আমাদের নিকটে তুমি স্বীয় মহিমাতে প্রকাশিত হও।

নববর্ষে কর্ত্তব্য।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই পবিত্র সময়ে এই পবিত্র উপাসনা-মণ্ডপে আমরা জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। পুরাতন বৎসর একদিকে অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। নববৎসর অপর দিকে নবজীবনের মুক্ত ভাণ্ডার লইয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। যে প্রাণসখা আমাদিগকে আজ জীবনমরণের ভিতর দিয়া এখানে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার নামকীর্ত্তনের দ্বারা জীবনকে ধন্য করিবার অবসর দিয়াছেন, আজ এই বৎসরের প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণাম কর। কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। তাঁহার অমৃতধামের যাত্রীগণের মধ্যে সকলের অগ্রগামী হও—সকলের অগ্রে তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও।

আজ এই বৎসরের প্রারম্ভে সেই প্রাণসখা জীবনসুহৃৎ তাঁহার সহস্র বাহু বাড়াইয়া আমাদিগকে প্রেমের আলিঙ্গন দিবার জন্য এবং তাঁহার স্নেহহস্তে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি-অর্ঘ্য গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার বিজন আসন হইতে নামিয়া আসিয়া এখানে দাঁড়াইয়াছেন। তাই আজ এই সুন্দর প্রভাতে পাখীরা সুতান গীত গাহিতেছে, পুষ্পসকল সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। তাই আজ শত দুঃখ-শোকের মধ্যে, শত শেলসম আঘাত ভেদ করিয়াও দিকে দিকে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিতেছে; তাই আজ দিকে দিকে তাঁহার নামে সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া জগতবাসীকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। চক্ষু খুলিয়া দেখ, কান পাতিয়া শোন, আজ শতকণ্ঠে তাঁহার নামে সঙ্গীত উঠিয়া ভূলোক ও দ্যুলোককে এক করিতেছে, ইহলোক ও পরলোককে প্রেমের সূত্রে বাঁধিতেছে—মঙ্গল ও কল্যাণের এক সুরে সকল ভুবনকে ডুবাইয়া দিতেছে। এমন মধুর প্রাতঃকাল অবহেলায় বৃথা কর্ম্মে বহিয়া যাইতে দিও না। বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে আজ তাঁহাকে উপলব্ধি কর; আজ সকলের মুখে আনন্দশ্রীতে তাঁহাকে উপলব্ধি কর; এবং অন্তরে নিজ নিজ হৃদয়ের আনন্দে সেই আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি কর।

তোমাদের জ্ঞান ও প্রেমকে সমুজ্জ্বল কর। একনিষ্ঠ হৃদয়ে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য যত্নবান হও। বীরের ন্যায় সকল বাধাবিঘ্নের মধ্যে অটল হইয়া থাকিও। তাঁহার জন্য আবশ্যক

হইলে সংসারের যাহা কিছু, সমস্তই ত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে। সুখসম্পদের ন্যায় দুঃখশোক বিপদআপদ সমস্তই তাঁহারই মঙ্গল বিধান বলিয়া সন্তোষের সহিত নত মস্তকে বহন করিবে। বিবেক ও বৈরাগ্যকে সহায় করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইবে। তাঁহার অভয়পদ নিশ্চয়ই লাভ করিবে। মৃত্যুও তোমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না। ইহলোকে যখন তোমাদের কর্ম্মের অবসান হইবে, তখন তাঁহার সেই অভয়পদ আশ্রয় করিয়া হাসিতে হাসিতে সংসারের পরপারে উপনীত হইবে। তাঁহার করুণায় তোমাদের অনন্ত জীবন ভরিয়া উঠিবে।

আজ তাঁহারই পবিত্র নামে তোমাদের প্রাণ জাগিয়া উঠুক—ভগবানের সঞ্জীবনী শক্তির নবতর স্পর্শে শক্তিময় হউক। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহতারা যেমন শতবিধ ছন্দে তাঁহারই নামের জয়গান করিয়া সুবিস্তীর্ণ গগনপ্রাঙ্গণকে এক আশ্চর্য্য সুরে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, তেমনই তোমাদেরও অন্তরে তাঁহার নাম দিবানিশি শতবিধ তানে ও সুরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হউক। তিনিই আমাদের পরম গতি, তিনিই আমাদের পরম শান্তি। তিনিই জগতজীবন, তিনিই সন্তাপহারী ভক্তবৎসল। তিনিই দুর্ব্বলের বল, অনাথের আশ্রয়। তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাক। তিনিই তোমাদের সমস্ত পাপতাপ হরণ করিয়া, সকল দুঃখকষ্টের অবসান করিয়া সুখসম্পদ বিধান করুন।

আজ আমাদের মন-প্রাণ তাঁহার মঙ্গলস্পর্শ লাভ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহারই চরণে ধাবিত হইতেছে। আনন্দের নির্ম্মল নির্ঝর আজ চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—হৃদয়নদীর দুই কূল ভাসাইয়া দিতেছে। আজ এই নূতন বৎসরের প্রথম দিবসে তোমাদের নিজের বলিয়া কিছুই রাখিও না। তোমাদের সমস্তই তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া দাও। তাঁহার প্রেমের ধারায় তোমাদের দুঃখশোকের জ্বলন্ত হুতাশন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হৌক, বিপদআপদের বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন হৌক। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও না। তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে ইহজীবনে যেমন, মরণেও সেইরূপ অনুপম শান্তি লাভ করিবে। তাঁহাকে পরিত্যাগ কর—ভয় হইতে ভয়ে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে এবং দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে নামিতে থাকিবে।

আজ কনকভানুর জ্যোতিতে সেই মঙ্গলময়ের প্রকাশ উপলব্ধি কর। প্রকৃতির ভিতরে তাঁহারই প্রসন্নমুখের মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিয়া তাহা দ্বারা হৃদয়কে পূর্ণ কর। তোমাদের অন্তরের অন্ধকার কাটিয়া যাক। তোমাদের জীবন নবভাবে নবোৎসাহে পূর্ণ হৌক। তাঁহার অরূপ রূপের ধ্যানে আপনাকে অনুক্ষণ নিমগ্ন রাখ, তাঁহার বাণীর অনাহত নাদ অনুক্ষণ শ্রবণ কর। তোমাদের চারিদিকে আনন্দের মঙ্গলবায়ু প্রবাহিত হৌক, সুগন্ধে গগন ভরিয়া উঠুক। মৃত্যুর বিভীষিকা তোমরা অতিক্রম কর।

আজ সমস্ত প্রকৃতি তাঁহার নামে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদেরও আজ জাগিয়া উঠিতে হইবে। আমাদের আজ আলস্যের কোলে মাথা রাখিয়া আরাম উপভোগ করিতে থাকিলে চলিবে না। সমস্ত গগন আজ আনন্দধারায় উথলিয়া উঠিতেছে। আমাদেরও আজ আনন্দ-মনে তাঁহারই জয়গান গাহিতে হইবে এবং তাহারই তালে তালে মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের হৃদয় হইতে যে জয়গান সমুত্থিত হইতেছে, তাহার তানে তানে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে আনন্দের নব নব তরঙ্গ জাগিয়া উঠুক এবং তাহারা আনন্দময় ভগবানেরই চরণতলে ধাবিত হৌক। আজ তোমাদের হৃদয়কে নিজেরই সুখদুঃখের চিন্তাতে নিমগ্ন রাখিলে চলিবে না—অন্তরকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিলে চলিবে না।

আজ তাঁহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ কর। তিনিই লোকসকলকে সেতুস্বরূপ হইয়া ধারণ করিতেছেন। তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ কর। তিনি আমাদের অন্তরতর অন্তরতম প্রাণসখা। চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া সেখানে তাঁহারই আসন প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁহার পূজায় মনপ্রাণ অর্পণ কর—তোমাদের সকল ভয়, সকল দৈন্য বিদূরিত হইবে; দেবদুর্লভ অমৃতধাম সহজেই তোমাদের হস্তগত হইবে। অমৃতধামের পথে যদি কখনও তোমাদের শ্রান্তি-ক্লান্তি আসে, তখন তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া পথের শ্রান্তি দূর করিও এবং বিজয়ীর বলে অগ্রসর

হইও। তাঁহার জয়ে তোমাদেরই জয়। ইহলোকে বা পরলোকে সর্ব্বত্রই তাঁহার স্নেহপ্রেমে আবৃত আছ জানিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হও।

বিগত বৎসরে দুঃখেশোকে বিপদেআপদে তোমাদের কাহারও অন্তর যদি নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকে, তবে আজ সেই দয়াঘন পরমেশ্বরের চরণে আছড়াইয়া পড়—সকল দুঃখের শান্তি হইবে। পাপেতাপে যদি তোমাদের কাহারও অন্তর জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া থাকে, তবে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমপুরুষের শরণাগত হও—তিনি তাঁহার স্নেহ-প্রেমের শান্তিধারায় তোমার সকল পাপ সকল তাপ বিধৌত করিয়া দিবেন। নিজ দোষে ভুলভ্রান্তি করিয়া যদি কেহ আপনাকে তাঁহা হইতে দূরে রাখিয়া থাক এবং তাঁহার করুণাবারিতে বঞ্চিত হইয়া তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হইয়া থাক, তবে স্নেহকরু-ণার সেই অক্ষয় উৎসের নিকটে যাও—তাঁহার প্রেমসুধায় তোমার হৃদয় ভরিয়া যাইবে।

আজ এই পবিত্র প্রাতঃকালে হৃদয়ের নিভৃত-তম প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হও। ভক্তিপ্রেমের সুগন্ধে এই প্রাতঃকালকে পবিত্রতর করিয়া তোল। অহঙ্কার অভিমান গর্ব্ব সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র প্রভু বলিয়া বরণ কর। তাঁহারই আদেশপালনে সমস্ত জীবন, সমস্ত ইচ্ছা ও শক্তি নিয়োগ কর। সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দধারায় অভিষিক্ত হইয়া তোমাদের মনপ্রাণ আজ আনন্দময় হইয়া উঠুক এবং তোমাদের আনন্দধ্বনিতে সমস্ত গগন আজ মুখরিত হউক। আনন্দের অশ্রুতে আজ সকলের বক্ষ ভাসিয়া যাউক। তাঁহাকে প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর, তাঁহার অভয়বাণী শ্রবণ কর—তোমা-দের সকল আশা পূর্ণ হইবে, তোমাদের প্রাণের সকল পিপাসার শান্তি হইবে। তাঁহাতেই আমা-দের সকল ভোগ, সমস্ত প্রেম, সমস্ত ইচ্ছার পরিসমাপ্তি।

নমস্কার।

"ওঁ যো দেবোহগ্নৌ"

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

ভৈরবী।

যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে
যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে
যিনি তৃণ-তরু-ফুলে-ফলেতে
তাঁহারে নমস্কার।

যিনি এই নীল ঘন আকাশে
যিনি এই সুরভিত বাতাসে
রবি-শশী-তারা-প্রকাশে
তাঁহারে নমস্কার॥

যিনি অন্তরে ও বাহিরে
যিনি যখনি যেখানে চাহি রে
ঘর যাঁর সব ঠাঁই রে
তাঁহারে নমস্কার।

যিনি এ-দেহে ও মনে শক্তি
অন্তরে চির ভক্তি
যিনি পরম গতি ও মুক্তি
তাঁহারে নমস্কার।

এ-হৃদয়ে যিনি শান্তি
বাহির ভুবনে কান্তি
যিনি নাশের সকল ভ্রান্তি
তাঁহারে নমস্কার।

যিনি জন্মমরণ-ভয়
করি' দেন সব ক্ষয়
যিনি বিতরেন বরাভয়
তাঁহারে নমস্কার।

এস সবে তাঁরে জানি
তাঁরে জীবনেশ মানি
ঘুচে যাক্ যত গ্লানি
তাঁহারে নমস্কার।

পুণ্য হৃদয়ে তাঁর
করি পূজা বারবার
কেটে যাক্ মোহভার
তাঁহারে নমস্কার॥

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

(ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি. এস্-সি)

(রাধানগরের সাহিত্য সম্মিলনে বিজ্ঞানশাখার সভাপতির অভিভাষণ)

আলোচ্য বিষয়ে কোনও কথা বলার পূর্ব্বে আমার প্রতি এবারের বিজ্ঞানশাখার পরিচালনের ভারার্পণ জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অযোগ্য হস্তে গুরুভার পড়িলে যাহা হইয়া থাকে এস্থলেও তাহাই ঘটিয়াছে। আপনাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমার দীন নিবেদন, আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

নূতন বাঙ্গালার সকল সাধনার আদি প্রবর্ত্তক এবং বিশেষভাবে সরল বাঙ্গালা গদ্য লিখনপ্রণালীর প্রথম পথপ্রদর্শক * ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচলনের প্রধান উদ্যোক্তা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়া অভ্যর্থনাসমিতির কর্ত্তৃপক্ষেরা নব বাঙ্গলার আদি তীর্থে আজ সাহিত্যসেবীদিগকে একত্রিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা সকলেই তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। লাঙ্গলপাড়া রামমোহনের পিতৃভবন, রঘুনাথপুর রামমোহন রায়ের নিজস্ব আবাসস্থল, উভয় পল্লীই তাঁহার জন্মস্থান রাধানগরের পারিপার্শ্বিক গ্রাম। সম্মিলনের তেরাত্রিবাসী তীর্থযাত্রীরা এই তিন গ্রামে অভ্যর্থনাসমিতির অতিথি হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবানই মনে করিতেছেন।

বিজ্ঞানে ভারতবাসীর পৈত্রিক সম্পদ সামান্য নহে। কিন্তু ১৬০২ খৃষ্টাব্দের পরে এদেশে বিজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার মৌলিক গবেষণা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল . †

বিজ্ঞানশিক্ষার ধারা এদেশে পুনঃপ্রচলনের জন্য ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে (১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে) রাজা রামমোহন তাঁহার দেশবাসীদের পক্ষ হইতে লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট যে আবেদনপত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন আপনারা সকলেই সেই পত্রের কথা অবগত আছেন। অনুবাদ না করিয়া ঐ পত্র হইতে কয়টি ছত্র এইস্থানে উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। লুপ্ত বিজ্ঞানালোচনার পুনরুদ্ধারে রাজার আগ্রহ মুখবন্ধরূপে সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখার কার্য্যের সহায় হউক।

"I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote. It will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences which may be accomplished * * * * by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providing colleges furnished with necessary books, instruments and other appartus * * * * to instruct in those useful sciences in which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above inhabitants of other parts of the world."

বাঙ্গালার গদ্যের ও বাঙ্গালার বিজ্ঞানের সেই আদিপ্রবর্ত্তক মহাত্মার জন্মস্থানে দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আমরা তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণের সুযোগ গ্রহণ করিতেছি।

অনেকেই মনে করেন "বিজ্ঞান" কথাটা ইংরেজী scienceএর নামান্তর। বাঙ্গালার প্রচলিত সাহিত্যে এ শব্দটি এই অর্থে কে প্রথম ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। ১৩০৪ সালের সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় "জ্ঞান শব্দের উপরে উপসর্গের প্রয়োগ" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিছু প্রাচীন তত্ত্ব সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন প্রভৃতিতে বিজ্ঞানশব্দের বহুল ব্যবহার রহিয়াছে।

"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ"

(অমর, প্রথমকাণ্ড ধীবর্গ)

ভরতমল্লিক "শিল্পশাস্ত্র" বলিতে চিত্র, ব্যাকরণাদি চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যার কথা ধরিয়া লইয়াছেন। পঞ্চদশীর টীকায় বিজ্ঞান "নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

গীতার টীকায় রামানুজ বিজ্ঞান বলিতে বিবিক্তাকারবিষয়জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত চিৎ, অচিৎ বস্তুর জ্ঞান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আবার তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে বিজ্ঞান শব্দে "নিখিল ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এ সব সংস্কৃতমূলক ব্যাখ্যায় প্রবেশ করিবার আমার

* মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উঁহাদের বাড়ীতে বাঙ্গালা গদ্যে একশত বৎসরের পূর্ব্বের লেখা একখানা স্মৃতিগ্রন্থের কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। শুনিয়াছি উহার ভাষা ও অক্ষর এত দুর্ব্বোধ্য যে উহাকে গদ্যের আদর্শ না বলিলেও চলে।

† "The decline of scientific knowledge among Hindus does not date back from a remote period, the last of the annotations on scientific works, which are characterised by skill, acuteness, intelligence and judgement is dated 1602 A. D. "*Civilization in Ancient India*" (1903), P, 57.

কোনও অধিকার না থাকিলেও মোটামুটি ইহা সাহস করিয়া বলা যায় যে ইংরেজীতে science বলিতে যাহা বুঝায়, প্রাচীন সংস্কৃতে ব্যবহৃত "বিজ্ঞান" কথাটি তাহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিতে কোনওরূপ আপত্তির কারণ নাই। ইংরেজীতে জ্ঞানশিক্ষার শাস্ত্রগুলিকে মোটামুটি science এবং Art এই দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। যে সব শাস্ত্র সত্যের সাধনায়, সত্যের অনুশীলনে, সত্যনিরূপণে নিযুক্ত সেগুলিকে Science, আর যেগুলি সৌন্দর্য্যের আরাধনা, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যের চর্চ্চায় নিযুক্ত, সেগুলিকে Art নামে অভিহিত করা হয়। *

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, শব্দশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্তই গণিত জ্যোতিষাদির সঙ্গে Scienceএর অন্তর্গত। আর Art বলিতে কাব্য, সাহিত্য, ভাস্করবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি চিত্তবিনোদনকারী সুকুমার কলাশাস্ত্র বুঝায়। রস ও রূপতত্ত্ব Artএর অধিকার; রসাত্মক বাক্য কাব্য, রূপ-রচনায় চিত্রকর ও ভাস্কর-স্থপতিদের লালিত্যের অপরূপ সৃষ্টি। লীলা খেলা লইয়া রূপজগতে আনন্দের অবতারণা Art এর অঙ্গীভূত।

বিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা দাঁড়াইতেছে তাহাতে শব্দের দ্ব্যর্থতা সত্যানুসন্ধানের ও সত্যনিরূপণের বিশেষ প্রতিবন্ধক। একটি শব্দের দুই অর্থ বা একই অর্থে দুইটি শব্দ সত্য নির্দ্ধারণে বিশেষ অসুবিধা জন্মাইয়া থাকে। সেই জন্যই বিজ্ঞানবিভাগে পরিভাষা লইয়া সর্ব্বদা উৎকণ্ঠার উৎপত্তি। সাহিত্যপরিষদ ও সাহিত্যসম্মিলন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনে বিশেষ উদ্যোগী ও একার্য্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে আপনাদের নিকট আমার একটা বিশেষ নিবেদন আছে আর তাহার উপপত্তির জন্য আমাকে কতকগুলি বাহুল্যের অবতারণা করিতে হইতেছে বলিয়া সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

অনেক দিন হইতে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকারগণ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির অনুবাদ করার সময় অনেক নূতন নূতন শব্দের উদ্ভাবন করিতেছেন। বৈজ্ঞানিক শব্দ চয়নপ্রণালীর যে বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি রহিয়াছে তাহা জানিবার তাঁহাদের সুবিধা হয় নাই বলিয়া বৈজ্ঞানিক বাঙ্গালা ভাষায় এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইতেছে। ইহাঁদের নূতন শব্দ চয়নের প্রণালী নানারূপ—কতকগুলি আক্ষরিক, কতকগুলি শাব্দিক, আর কতকগুলি মূল শব্দের আর্থিক অনুবাদ।

দুই একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় আমার কথাটা একটু পরিষ্কার হইবে। প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় উচ্চ প্রাইমারীর বিজ্ঞানপাঠ ম্যাকমিলান কোম্পানি বাহির করিয়াছিলেন। উহা পাঠশালার ছেলেদের মুখস্থ করিতে হয়। এই বইয়ে অনুবাদিত শব্দগুলির একটা নমুনা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে চাই। "Weathercock" এর বাঙ্গালা করা হইয়াছে "আবহাওয়ানির্ণয়কারী মোরগ"। এরূপ হাস্যকর উদ্ভাবিত শব্দের সংখ্যা বহুল। মনে রাখিবেন ইহা প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য গ্রন্থ। "আবহাওয়া" আমাদের দেশপ্রচলিত একটি উর্দ্দু শব্দ। আমরা জানিতাম উহার অর্থ "জলবায়ু"। কোনও অপরিচিত স্থানের জলবায়ু কিরূপ, সেই অর্থেই "আবহাওয়া" চলিয়া আসিতেছিল। জলবায়ুর ইংরাজী আমরা জানিতাম "climate"। ইংরেজী climate এবং weather সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। আমরা আবহাওয়া অর্থে climate বুঝিতাম; আমাদের ছেলেদের মুখস্থ করিতে হইল আবহাওয়া অর্থে "weather"। আবহাওয়ার এই নূতন প্রয়োগ ক্রমে সাধারণ ব্যবহারে আসিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা দৈনিক পত্রে এই আবহাওয়া এক্ষণে weather Reportএর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে।

এরূপ শত শত ভুল শব্দ অনুবাদিত হইয়া ভাষার আবিলতা বৃদ্ধি করিতেছে। ইহার সংস্কারের একটা স্থায়ী চেষ্টার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক ভাষা সঙ্কলনে ইহার আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আপনাদের সকলেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে, এরূপ আর একটা নূতন উদ্ভাবিত শব্দের কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। শব্দটি Diarchy—উহার অনুবাদ কাগজওয়ালারা এখন লিখিতেছেন "দ্বৈত শাসন"!! "দৈত্য শাসন" কথার উচ্চারণসাদৃশ্যে মনে হয় কেহ বুঝি মহাত্মা গান্ধীর "Satanic Government" কথার সঙ্গে সমতা রক্ষার জন্য উপহাস করিয়া ঐরূপ সমভাবে উচ্চারিত দ্ব্যর্থসূচক শব্দের উদ্ভাবন করিয়াছেন। আর একজন ঐ শব্দের বাঙ্গালা করিয়াছিলেন "দ্বিধা-বিভক্ত শাসনতন্ত্র"। এই তর্জ্জমাটিতে অর্থানুভব হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এক "বসুমতী" ভিন্ন অন্য কোনও কাগজে বা গ্রন্থে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখিতেছি না। আর একটি শব্দের কথাও উল্লেখ করিব। শঙ্কর তাঁহার পাতঞ্জল ভাষ্যে "প্রাকৃতিক আপূরণ" বলিয়া একটি পদের উল্লেখ করিয়া

* অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Science এবং Artএর বিভাগের সঙ্গে আমাদের এই বিভাগ বা সংজ্ঞা মিলিবে না।

তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতে স্পষ্টই ঐ শব্দে "fossil" বুঝায়। অথচ fossil এর অনুবাদের জন্য একটি নূতন শব্দ রচনা করা হইয়াছে তাহা "জীবাশ্ম"। আমরা নূতন শব্দ কিরূপ অনভিজ্ঞের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করাইতেছি তাহার আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা সকলেই ধ্রুব নক্ষত্রের কথা জানেন। ইহারই পারিপার্শ্বিক দুইটি নক্ষত্রমণ্ডল সকলেরই বিশেষ পরিচিত। বিষ্ণুপুরাণে (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১২ কল্প, ২৬ ও ২৭ শ্লোকে) এই দুই নক্ষত্রমণ্ডলের বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত তথাদৃষ্ট ছোট মণ্ডলটি ধ্রুব নক্ষত্রের অধিক সন্নিকট—উহার নাম "শিশুমার"; আর দূরস্থিত বৃহত্তর নক্ষত্রমণ্ডলটির নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল বলিয়া পুরাণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহাদের বিশেষ উল্লেখ আছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল (সপ্ত+ঋষি) অনেক সময় সপ্ত ঋক্ষমণ্ডলরূপে লিখিত হইয়াছিল। ঋক্ষের অর্থ ভল্লুক—সেই হেতু লাটিন ভাষায় এই মণ্ডল দুইটির নামকরণ হইয়াছিল Ursa major এবং Ursa minoris। বুঝিতে কাহারও কষ্ট হওয়া উচিত নয় যে এই লাটিন নাম দুইটার জন্য ইউরোপীয় শব্দ ভারতীয় জ্যোতিষের নিকট ঋণী। ইংরেজী তরজমায় ইহাদের পরিচয় ও সংজ্ঞা Great Bear এবং Little Bear। আর আমাদের দেশে ছেলেদের জন্য যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বাঙ্গলায় তাঁহারা ইহাদের নাম ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন বড় ভল্লুক ও ছোট ভল্লুক!! দেখুন আমাদের "শিশুমার" কি আশ্চর্য্য অবরোহণ-প্রণালীতে ছোট ভল্লুকে দাঁড়াইয়া আমাদের ভাষাতেই ঘুরিয়া আসিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক শব্দ ও সংজ্ঞা উদ্ভাবনের কতকগুলি নিয়মপ্রণালী আছে। ঐ গুলিকে "নামবাদ" (Rules of Nomenclature) বলা হইয়া থাকে। এই নিয়মের একটা প্রধান সিদ্ধান্ত হইতেছে পূর্ব্ববাদ (Law of Priority)। এক অর্থে বহু শব্দ প্রচলন রোধ করার জন্য এই সিদ্ধান্তটির বিশেষ প্রয়োজন। এই নিয়মটির কথা মনে রাখিলে, পরিভাষা সংকলন অতি সহজ কাজ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদিগকে একটু বিব্রত হইতে হইবে। বিজ্ঞানের আলোচনা আমাদের দেশে ইয়োরোপীয় সংশ্রবের (তাহা গ্রীকীয়ই হউক আর ইংরেজীই হউক) পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা অতিশয় ভ্রান্ত বলিলে একটুকুও অন্যায় হইবে না। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বহুল বিলোপ সাধিত হইয়া থাকিলেও প্রক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ উপলব্ধি করাও কঠিন। পণ্ডিতেরা বলেন, ঋগ্বেদে আমাদের সকলেরই বিশেষ পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল "কালপুরুষ" (Orion) "প্রজাপতি" নামে অভিহিত হইয়াছে এবং রোহিণী নক্ষত্রের উল্লেখ আছে।

বীজগণিত ও জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের ভূরি ভূরি গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান। আর যে সব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে, পুরাণ ও ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রে তাহার অনেক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থান পাইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের এক অধিবেশনে "হিন্দু ও বৌদ্ধ" বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে অনেকগুলি ঐরূপ শব্দের উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখানে তাহার দুই-একটি উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। syllogism সংস্কৃত "অবয়ব" শব্দের প্রতিশব্দ; যাঁহারা বাঙ্গালায় syllogism এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহারা উহার জন্য নানারূপ নূতন শব্দের উদ্ভাবন করিয়াছেন। অধ্যাপক Cystalএর নিকট প্রথম শুনিয়াছিলাম, ব্রহ্মগুপ্ত বীজগণিতের আদি আবিষ্কারক। এখন জানা যাইতেছে ব্রহ্মগুপ্তেরও বহুপূর্ব্বে বীজগণিতের অতি সূক্ষ্ম সমস্যা "কুট্টক" (Integers) ইত্যাদির সমাধান শ্রীধর পদ্মনাভ প্রভৃতি কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। নূতন করিয়া এখন যিনি বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বীজগণিত লিখিবেন, তাঁহার এই সব প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনা না করিয়া নূতন পরিভাষা চয়ন করিলে চলিবে কেন?

বীজগণিতের যে অবস্থা, অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাই। চিত্রবিদ্যা স্থাপত্যবিদ্যা ব্যবহারিক শিল্প, চিকিৎসাশাস্ত্র এই সমস্ত বিভাগেই রাশি রাশি গ্রন্থ এখনও বর্ত্তমান। "মানসার"এর ন্যায় সুবৃহৎ গ্রন্থ এইরূপ শব্দভাণ্ডারে পূর্ণ। সেগুলি ভুলিয়া বা না বুঝিয়া নূতন নূতন শব্দ আবিষ্কার করা কি বাতুলের কার্য্য হইবে না? আমাদের অনেকেরই ধারণা, উদ্ভিজ্জ বিদ্যাবিভাগে প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থ দরিদ্র। আয়ুর্ব্বেদের বিপুল ভেষজসম্ভার ছাড়িয়া দিলেও যে শব্দসম্পদ এই বিভাগের জন্য রহিয়াছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। আধুনিক উদ্ভিদবেত্তারা হয় ত ভাবেন নাই যে, মনু পর্য্যন্ত উদ্ভিদাদির সুন্দর শ্রেণীবিভাগ করিয়া গিয়াছেন (মনু ১ম অধ্যায় ৪৬-৪৮ শ্লোক)। রসায়নশাস্ত্রে রসেন্দ্র চিন্তামণি, রসরত্নাকর প্রভৃতি বিভাগীয় বিশিষ্ট গ্রন্থ ব্যতীতও তন্ত্রে পুরাণে কত পরিভাষা রহিয়াছে। জীববিদ্যাবিদেরা হয় ত শুনিলে কৌতূহলী হইবেন যে, টিনিয়া সলিয়ামের (*Taemia solium*) অদ্ভুত জীবনপ্রবাহের বিবরণ অথর্ব্ববেদে বর্ণিত রহিয়াছে। আর সম্ভবত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অথর্ব্ববেদের নিকট উহার

বিবরণ এমন কি নামের জন্যও ঋণী। শ্রীযুক্ত ডাক্তার গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এরূপ কত দৃষ্টান্তের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার পূর্ণ বিবরণের জন্য আমরা সকলে আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করিতেছি। সুশ্রুত বিষচিকিৎসা ব্যপদেশে সর্প, মক্ষিকা, কীট, কৃমির শ্রেণীবিভাগের যে সব বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন তাহা দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ঐ সব শ্রেণীবিভাগ বিশেষ বিশেষ মৌলিক জীববিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত।

দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া মোটামুটী বলিতে চাই যে, বঙ্গে বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভবপর করিতে হইলে বিশুদ্ধ পরিভাষার সঙ্কলন অতিশয় গুরুতরভাবে আবশ্যক। আর উহার জন্য প্রথম প্রয়োজন হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে যে সব বৈজ্ঞানিক শব্দ রহিয়াছে তাহার তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা। তাহা না হইলে নূতন উদ্ভাবিত উদ্ভট শব্দের আমদানীতে বাঙ্গালার শিশু বিজ্ঞানসাহিত্য বৃথা বাগ্‌জালে আচ্ছন্ন ও মুহ্যমান হইয়া পড়িবে। সাহিত্য-পরিষদ এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু আমার মনে হয় এই সম্মিলনক্ষেত্রেই ইহার প্রকৃত বিধায়ক হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে আমার যে নিবেদন আছে, তাহার প্রণালী নির্দ্ধারণ জন্য যথাসময়ে আপনাদের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তবে তাহারই পূর্ব্বাভাসরূপে আরও দুই চারিটি কথা এই অভিভাষণে আলোচনা করিতে চাই। আমার মনে হয় সম্মিলনের কার্য্যকরী শক্তি তিন দিনের বক্তৃতার উৎসবে ও আদর আপ্যায়নে শেষ না হইয়া একটা বর্ষব্যাপী কার্য্যপ্রণালীর সমাধানের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আর পরিভাষা সঙ্কলন, পরিভাষার আলোচনা ও সংস্কার তাহার একটা প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে সম্মিলন চারি শাখায় বিভক্ত। সাহিত্য, দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান। পুরাতত্ত্বও যে বিজ্ঞানেরই শাখা তাহা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। এই প্রত্যেক বিভাগেই ভাষাসম্পদ নূতন নূতন শব্দসম্ভারে দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে। আমার মনে হয় প্রতি বৎসরে নবরচিত শব্দমালার একটা নির্ঘণ্ট বর্ষব্যাপী চেষ্টায় প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। প্রতি বিভাগে বর্ষকালের জন্য এক একটি স্থায়ী ক্ষুদ্র সমিতি বার্ষিক অধিবেশনে গঠিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি এরূপ একটি প্রস্তাব আপনাদিগের সম্মুখে এবার কার্য্যকরী অধিবেশনে উপস্থিত করিব। সাহিত্যপরিষদের সহায়তায় আপনাদের নিযুক্ত সেই সমিতি বর্ষব্যাপী চেষ্টায় আগামী বর্ষে যতগুলি নূতন বাঙ্গালা শব্দ বাঙ্গলায় নূতন প্রকাশিত গ্রন্থে, সাময়িকপ্রবন্ধে ও সংবাদ-পত্রে নূতন ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করিবেন, শব্দকর্ত্তার নাম ও গ্রন্থপত্রের পরিচয় সহ তাঁহারা ঐ সব শব্দের একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিবেন। বর্ষশেষে আগামী সম্মিলনের কার্য্যকরী সভায় সেই নির্ঘণ্ট উপস্থাপিত করা হইবে; তখন ঐ সব নূতন শব্দের বৈধতা, ব্যবহারশুদ্ধতা, প্রাচীন পর্য্যায়ের শব্দাদির সহিত সমালোচিত হইবে। ঐ নির্ঘণ্ট আলোচিত মন্তব্যসহ বার্ষিক বিবরণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। আমি কেবল বিজ্ঞান-শাখার জন্যই এই ব্যবস্থার বিশেষ আবশ্যকতা বোধ করিতেছি। কেননা গোড়াতেই বলিয়াছি, সত্যানুসন্ধান ও সত্যনিরূপণই বিজ্ঞানের কার্য্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য। এ বিভাগে সৌন্দর্য্যের রূপস্রষ্টার শ্লথ ভাব-ব্যঞ্জনের স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। আমার মনে হয় এইরূপ একটা নির্ঘণ্টের সাহায্যে আমরা আর কিছু না করিতে পারিলেও ছেলেদের "ছোট ভল্লুক" ও "আবহাওয়া-নির্ণয়কারী মোরগে"র ন্যায় হাস্যকর শব্দ গ্রথন করার বিড়ম্বনার কতকটা প্রতিরোধ জন্মাইতে পারিব।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার বিশুদ্ধতার জন্য বিপুল প্রাচীন সংস্কৃত প্রভৃতি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই। এই বিষয়ে বঙ্গের শাস্ত্রকুশল পণ্ডিতকুলের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত বাঙ্গালাভাষার বিজ্ঞানবিদের গত্যন্তর নাই। এ সব প্রমাণ করিতে উদাহরণের কোনও অভাব নাই—আবার আলোচনায় এ রকম সব শব্দ বাহির হইয়া পড়ে যে তাহাতে একেবারে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমরা তো সকলেই জানি, gun powderএর বাঙ্গলা বারুদ। বারুদ কথাটা উর্দ্দু—আর জিনিসটা চৈনিক। ইহাই ত আমাদের সকলের ধারণা। অথচ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতেরা বলেন "ঔর্ব্বাগ্নি" প্রাচীন সংস্কৃত কথা—শুধু কথার কথা নহে; পণ্ডিত নন্দকুমার কবিরত্ন তাঁহার নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাতে নীতিচিন্তামণি হইতে উহার প্রস্তুতের প্রণালী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"দগ্ধেধং শোরকঞ্চৈব পার্ব্বত্যা বীর্য্যমেব চ।
একীকৃত্যাংশভাগেন ক্রমাক্ষ্যা সাম্ভবেদিতি (?)॥"
"দারুণো হুতভুক্ তেন দহ্যতে সলিলাদিকং।"

শুধু বারুদ নয়, মনু ছয় প্রকার দুর্গের বর্ণনা করিয়াছেন (৭ম অধ্যায়—৭০, ৭৫ এবং ৭৬ শ্লোক)। আর "শতঘ্নী" বলিতে কি কামান বুঝিতে হইবে? মহাভারতে, রামায়ণে উহার উল্লেখ আছে। আর শ্রীকৃষ্ণ শল্যের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় দ্বারকাকে সুরক্ষিত রাখিয়া গিয়াছিলেন।

"ঔর্ব্বাগ্নিং প্রোথিতং কৃত্বা শতঘ্নীং গুড়কৈর্যুতাং।"
হরিবংশ।

তবে "প্রবাদ" অপ্রামাণ্য, শাস্ত্রের "শ্লোক" প্রক্ষিপ্ত, ইহাই আমাদের ঐতিহাসিকদিগের সিদ্ধান্ত। মাটি খুড়িয়া তুলিতে না পারিলে বর্ত্তমান পুরাতত্ত্বে কোনও কথা

গ্রহণযোগ্য হয় না। সৌভাগ্যক্রমে তাহাও হইয়াছে। Sir Arthur Cautley গঙ্গার জলপ্রণালীর খোদাই কার্য্যে সমতলের ৭০ ফিট নীচে হস্তিনাপুরের ভগ্নাবশেষ পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ছোট কামানের মত একটা যন্ত্র পাওয়া গিয়াছিল। উহাই কি "শতঘ্নী"? কামানকে "শতঘ্নী" না বলিতে চাও, উত্তম; কিন্তু "শতঘ্নী" বলিতে যে কামানের পূর্ব্বানুকৃতি বুঝাইবে তাহা না মানিলে চলিবে কেন?

গত বর্ষে নৈহাটী সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখায় পঠিত একটি প্রবন্ধে "আর্য্য" ও "দ্রাবিড়" এই দুইটি কথা লইয়া বাঙ্গালায় লোকতত্ত্বের লেখকেরা যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিতেছেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলাম। এই দুইটিই অতি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ। ম্যাক্সমূলার কুক্ষণে হিরাটের নিকটবর্ত্তী আরিয়ানা প্রদেশ হইতে Aryan শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রুতিসমতার জন্য আজ প্রাচীন "আর্য্য" শব্দ তাহার প্রতিশব্দে দাঁড়াইয়াছে। দ্রাবিড় বলিতে বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণবর্ত্তী মহারাষ্ট্র প্রভৃতি পাঁচটি প্রদেশকে বুঝাইত। আজ দ্রাবিড় এক কল্পিত "অনার্য্য" জাতির সংজ্ঞা হইয়াছে। আর এই দুই কল্পিত জাতির কাল্পনিক মিশ্রণে "আর্য্য-দ্রাবিড়সঙ্কর" "মোঙ্গল-দ্রাবিড়সঙ্কর" প্রভৃতি অদ্ভুত ও কাল্পনিক মিশ্র বর্ণের নামসংখ্যা বাড়িতেছে। গত বর্ষেই বলিয়াছিলাম, এই সমস্ত অনিষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায় লোকতত্ত্ব পাঠে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মনিয়োগ; প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিলে এসব বাক্জাল ও ভাষার আবর্জ্জনা বাড়িতে পারিবে না। আর একটা বিপদ ঘটিতেছে আমাদের হেলেনিক Hellenic ও পারসিক * মোহ হইতে। আমাদের ভিতর এখনও অনেকেরই যুক্তিপ্রণালী রাশিচক্রের কল্পিত ঐতিহাসিক তত্ত্বে ঘূর্ণ্যমান। কোনও কোনও সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—আলেকজেণ্ডারের ভারত-অভিযানের সময় ভারতীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রীকদের নিকট হইতে রাশিচক্রের নাম ও রূপ শিক্ষা করিয়া ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অমনই এই মাপকাঠি লইয়া তাঁহারা সমস্ত শাস্ত্র পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। আর যাহাতক ভারতীয় কোনও পুঁথি বা প্রস্তাবে রাশিচক্রের নাম বা গন্ধ পাওয়া গেল অমনি স্থির হইল তাহা ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। পুনঃ পুনঃ এই মাপকাঠির অলীকতা প্রদর্শিত হইলেও সেই হেলেনিক মোহ তাঁহাদের ঘুচিতেছে না। Sir William Jones হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক মনস্বী প্রাচীন গ্রন্থাদির সময় নিরূপণের এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তমূলক প্রণালী দূর করিতে লেখনী ধারণ করিয়াও কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই।

Epping Strassmaier, এবং Jensen উৎকীর্ণ ইষ্টকফলকের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন—খৃঃ পূঃ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে একেডিয়ান পঞ্জিকাতে ও তৎপর সেমেটিক বেবিলোনিয়ান ও আসিরিয়ানেরা ভারতীয় রাশিচক্রের ব্যবহার করিয়াছেন। † ভারতীয় শাস্ত্রে হেলেনিক সভ্যতার প্রভাব দেখাইয়া অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। আশা করি, এখন স্রোত ঘুরিয়া গ্রীক ও রোমক সভ্যতার ইতিহাসে ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা-প্রভাবের পরিচয়সম্বলিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের প্রচার দেখিতে পাইব।

সম্মিলন একটা বর্ষব্যাপী কার্য্যের সূচনা ও পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে না পারিলে ইহা কালে একটা তেরাত্রের বারোয়ারীতে পরিণত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। গভীর গবেষণাযুক্ত প্রবন্ধ পাঠের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সম্মিলন যে সাহিত্যসেবী সাধারণের জন্য যে একটা আদর-আপ্যায়নের সামাজিক মিলনক্ষেত্র তাহা আমরা অস্বীকার করি না। এই আরাম ও আনন্দদায়ক বার্ষিক উৎসব ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে বর্ষব্যাপী সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটা হিসাবনিকাশের বন্দোবস্ত রাখিলে বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষার একটা খতিয়ান দাঁড়াইতে পারে। বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনপক্ষে সম্মিলনের এইরূপ বার্ষিক নির্ঘণ্ট আলোচনার স্থান আছে কি না আপনারা যথাসময়ে তাহার মীমাংসা করিবেন, ইহাই আমার বিনীত নিবেদন।

পাটের চাষ।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

প্রথমতঃ বাঙ্গালায় পাটের চাষ সম্ভবতঃ গৃহকার্য্যের উপাদান এবং পশুর বন্ধনরজ্জু নির্ম্মাণ এই উভয়ের জন্যই আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বহুদিন হইতেই ইহার সহিত পূর্ব্ববঙ্গবাসীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণতঃ অনেকে এইমাত্র জানেন যে, পাটের চাষের দ্বারা বাঙ্গালায় বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী হয় এবং রাজার রাজস্ব মহাজনের প্রাপ্য টাকা প্রভৃতি পাটের মূল্য হইতেই আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গবাসীর সহিত এতদ্ব্যতীতও পাটের অনেক প্রকার সম্বন্ধ রহি-

---

* যথা—Parsi-politan polish,

† *Ancient calendars and constellations* by E. M. Plunket, pp. 102-5,

য়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা পাটের যাবতীয় সম্বন্ধ অর্থাৎ কোন্ কোন্ কাজে আমরা পাটের সহিত সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে সংস্থষ্ট, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্ববঙ্গের পাটপাতা তিক্তস্বাদ। মাঝে মাঝে অম্লস্বাদ পাটপাতাও পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের পাট-পাতা মিষ্টস্বাদ। তিক্ত পাটপাতার অনেক প্রকার ব্যবহার হয়। পাটের কচিপাতা ও ডগার শাক খুব মুখপ্রিয়। দুই-তিনটি ডগা জড়াইয়া বটকাকারে ভাজিয়া তাহার দ্বারা ঝোল পাক করিলে মুখরোচক খাদ্য হয়। অবশ্য ইহাতে ডাইলের বড়ী ও প্রচুর পরিমাণ ঘৃত দিতে হয়। মেয়েরা এই তরকারীকে 'ঝোলশাক' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পাটের পরিণত পাতা শুকাইয়া রাখা হয়, এবং ইহাকে 'ফোড়ন'রূপে ব্যবহার করিয়া খেঁসারী মসুর মটর ডাইলের উৎকৃষ্ট শুক্তা প্রস্তুত হয়। অন্যান্য তরকারীর শুক্তাতেও পাটপাতা ব্যবহার করা হয়। এই কারণেই পাটপাতার অপর নাম 'শুক্তাপাতা'। শুষ্ক পাট পাতা ভাজিয়া অথবা চূর্ণ করিয়া তৈল-লবণসংযোগে খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। তাহা মুখে থুথু উঠায় এবং আমাশয়ের ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। নব প্রসূতির পক্ষে এই চূর্ণ অতীব উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে নাকি শরীর অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হয়। ভাদ্র মাসে নষ্টচন্দ্রের পূর্ব্বে পাটপাতা সংগ্রহ করা হয়। নষ্টচন্দ্রের পরবর্ত্তী পাতা অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। উপবাসের পর পাটপাতা ভিজান জল পান করা হয়। ইহাতে উপবাসের গ্লানি বিদূরিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। চৈত্রের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পাট-পাতা খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা বাল্য-কাল হইতে মহাবিষুবসংক্রান্তির পূর্ব্ব হইতেই পাটশাকের ব্যবহার দেখিয়া আসিতেছি। কিন্তু দেশে যে চিরপ্রচ-লিত ছড়া আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রথম আমা-দের অঞ্চলে বৈশাখের প্রথমেই পাটের চাষ আরম্ভ হইয়াছিল। কবিতাটি এইরূপ—

"মাগী বলে মৈষা (মিন্‌সে) মোর কথা শুন। *
পর্ত্তম (প্রথম) বৈশাখে নালিতা বুন"॥

পাটের গাছ আমাদের প্রদেশে নাল্যা নামেই পরি-চিত। নালিতার অপভ্রংশে নাল্যা শব্দের উৎপত্তি বলিয়া মনে হয়। তিক্তরসের কোন বস্তুর তুলনা করিতে হইলে সাধারণে বলিয়া থাকে নাল্যা হালীর (বিচির) মত তিক্ত। ইহাতে মনে হয় প্রথম তিক্তস্বাদ নালিতারই চাষ আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বৈশাখের প্রথমেই সেই চাষ হইত। ক্রমে বীছুনের (বীজ) এবং চাষের সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে সকল নিম্নভূমিতে এখন পাটের চাষ হইতেছে, পূর্ব্বে এমত জমিতে কোন ফসল হইত না। এই সকল নিম্নভূমির পাট জ্যৈষ্ঠের শেষভাগ হইতেই কাটিতে আরম্ভ করে। ঐ সময় হইতেই জমিতে প্রচুর জল হইয়া পড়ে। নিম্ন জমির পাটকাটা বড় কঠিন ব্যাপার। অনেক স্থানেই ডুব দিয়া পাট কাটিতে হয়। বাম হাতে পাঁচ-সাতটি গাছ জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাতের দায়ের দ্বারা তাহা ডুব দিয়া কাটিতে হয়। অনেক সময়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার দরুণ কর্ত্তকের জীবনান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে, এমত শুনা গিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে অগ্রহায়ণের প্রথম পর্য্যন্ত এখন পাটের 'লওয়া ধোয়া ও শুকান' কাজ চলিয়া থাকে। পরিষ্কার স্রোত-জলে ধোয়া পাট ভাল হয় না। বিলের জলে অথবা পুকুরের জলে ধোয়া পাটেরই ভাল রং হয়। আমাদের দেশে গৃহস্থেরা পাট-পচানর জন্য ছোট ছোট পুকুরের মত গর্ত্ত কাটাইয়া থাকে। পাটের গাছ কাটিয়া আঁটি বাঁধিয়া জলে ডুবাইতে হয়। পাটের আঁটির নাম 'নাল্যাভূর', এবং কলারগাছ মাটি প্রভৃতির চাপ দিয়া ভূরগুলিকে জলে ডুবাইয়া দিবার নাম 'নাল্যাভূরান'। পাটগাছ ভালমত পচিলে তাহার ভিতর হইতে পাট-শোলা বাহির করিয়া পাটগুলিকে উপযুক্তরূপে গোছান কাজের নাম 'পাট লওয়া'। এই কাজটি অনেকস্থলে এখনও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। রাজসাহী প্রদেশে দেখিতে পাই যে, পাটের গাছগুলিকে লাঠির আঘাতের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া পাট বাহির করে। ইহাতে পাটশোলাগুলি একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে পাটশোলা অতি সযত্নে রক্ষিত হয়। এই পাটশোলা আমাদের দেশে পাটখড়ী নামে প্রসিদ্ধ। কলিকাতা অঞ্চলে ইহারই নাম পাকাটী।

পাটখড়ীর সহিত আমাদের এখন কতটা সম্বন্ধ তাহাই দেখাইতেছি। শিশুশিক্ষায় উটের সহিত আরবদেশবাসীর যেমন সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, পাটখড়ীর সহিতও আমাদের প্রায় তেমনই সম্বন্ধ দেখা যায়। গৃহস্থলোকের জ্বালানী কাঠের কাজ এই পাটখড়ী হইতেই সম্পন্ন হয়। অন্যান্য ভদ্রলোক প্রভৃতিরও পাকনিষ্পাদনে পাটখড়ীই প্রধান অবলম্বন। "আথা" ধরাণর কাজ পাটখড়ী ব্যতীত হয় না। পাটখড়ীর আটি জ্বালাইয়া অনেকে মশালের কাজ সম্পন্ন করে। কুশণ্ডিকা কার্য্যে হস্তপ্রমাণ পাটখড়ীর দ্বারাই গৃহীত হয়। ছোটখাট হোমক্রিয়ায় পাটখড়ীই যজ্ঞকাষ্ঠ-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাটখড়ীর ধূম মশকের বিশেষ প্রতিষেধক। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে মশার উপদ্রবে ঘরের ভিতরে পর্য্যন্ত বসা কষ্টকর হইয়া পড়ে। কিন্তু সন্ধ্যা-সময়ে ঘরের দরজায় কতকগুলি পাটখড়ীর অগ্রভাগ

* এই শব্দগুলি গ্রাম্য হইলেও অশ্লীল নহে। স্ত্রী স্বামীকে বলিতেছে, ইহাই এই পদের অর্থ।

জ্বালাইয়া ধুঁয়া করিয়া দিলে মশা চুপ করিয়া থাকে।

ক্ষেতের বেড়া, বাড়ীর চেগার (চারিদিকের ঘেরাও) পাটখড়ী হইতে সম্পন্ন হয়। ঘরের বেড়া এবং ছাউনীও পাটখড়ীর দ্বারা হইয়া থাকে। অনেকে পাটখড়ী গাঁথিয়া কায়দা করিয়া ছোট নৌকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। পাট-গাছের অগ্রভাগ যাহা কাটিয়া ফেলিয়া রাখে—তাহা পোড়াইয়া উৎকৃষ্ট টিকা প্রস্তুত হয়। পাটখড়ীর কয়লা হইতেও খুব হালকা টিকা হয়। কাঁকরোল, কলা, ঝিঙ্গা পটোল প্রভৃতি লতাজাতীয় উদ্ভিদের জাংলার (মাচা) কাজেও পাটখড়ীর ব্যবহার হয়। অতএব স্তন্যপায়ী শিশু যেমন স্তন ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না, পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থাও পাটের সহিত প্রায় তেমনই ঘটিয়াছে। পাটের মূল্য কম হইলেও পাটখড়ীর খাতিরে পাটের চাষ ছাড়িবার উপায় নাই। অনেক সময় হুজুগের বশে বিদেশী লোকেরা যাইয়া পাটের চাষ বন্ধ করিবার জন্য কত গলবাজী করিয়া থাকেন, তাহাতে ফল কিছুই হয় না। যাঁহারা দ্বিতল-ত্রিতলে বসিয়া থাকেন, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুই জানেন না, তাঁহাদের কথার মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না।

নীতিশাস্ত্রকার কামন্দক বলিয়াছেন যে, আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ড-নীতি, এই কয়টি বিষয় তত্তদ্বিদ্যার আচার্য্যের নিকট হইতে রাজা অবশ্য অবগত হইবেন। আচার্য্যগণের তত্তদ্বিষয়ে ক্রিয়োপেত অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা হওয়া দরকার। চাষবাসের কাজ ঘরে বসিয়া পুস্তক পাঠে শিক্ষা হয় না, মাঠে যাইয়া দেখা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে আমরা বার্ত্তাশাস্ত্রজ্ঞানে বড়ই মূর্খ হইয়া পড়িয়াছি। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের শাস্ত্রই "বার্ত্তা"। কামন্দকের টীকাকার সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, "ব্যবস্থাপিতধর্ম্মস্য লোকস্য জীবনহেতুর্বার্ত্তা' অর্থাৎ যে সমস্ত লোকের ধর্ম্মব্যবস্থা করা হয়, তাহাদের বাঁচিবার হেতুই বার্ত্তা। কামন্দক বিষয়বিভাগপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "অর্থানর্থৌ তু বার্ত্তায়াং" অর্থ ও অনর্থ এই দুইটি বার্ত্তাবিদ্যায় বর্ত্তমান। উপযুক্তকালে বীজবপন করিলে যে ফল হয়, তাহার নাম অর্থ; এবং অকালে বপন করিলে যাহা হয় তাহার নাম অনর্থ। দেশের স্বাধীনতার দিনে সমৃদ্ধির দিনে যে বার্ত্তাবিদ্যা বাঁচিবার উপায় বলিয়া অবধারিত হইয়া ছিল, তাহা আজ উপেক্ষিত। ইহাই সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া মনে হয়। পাড়াগাঁয়ের গৃহকোণ হইতে অরণ্যানীর ভিতর পর্য্যন্ত কত উদ্ভিদ রহিয়াছে, তাহাদের গুণাগুণ কত, কোন্ কোন্ উদ্ভিদ সহজলভ্য প্রাত্যহিক সুস্বাদু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আমাদের অশেষ হিতসাধন করিতে পারে, ঐ বিষয়ে আমাদের সযত্ন হওয়া আবশ্যক।

ভারতে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়।

(অধ্যাপক শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ)

দেখিতে দেখিতে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যার অঙ্ক ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই অল্প সময়ের ব্যবধানের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচারের সঙ্গে প্রদেশের পর প্রদেশে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লাবনের যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শকে দৃঢ়রূপে ধরিতে না পারিলে আমাদের দেশের ও জাতির উন্নতির আশা নিতান্ত অল্প।

জাতীয় আদর্শের উপলব্ধিই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান কর্ম্ম। সেইজন্য প্রাচীন ইউরোপে ধর্ম্মতত্ত্বই (Theology) সর্ব্বপ্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। তার পর জাতির অভাব অভিযোগের বৃদ্ধির সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্র শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া উঠিল। আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিকান বিশ্ববিদালয়ে কলা ও বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখার অশেষ উন্নতি বিধান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই জ্ঞানের মহাযজ্ঞে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মনস্বীগণ আহুতি প্রদান করিতেছেন। Cardinal Newman তাঁহার On the Scope and Nature of University education নামক পুস্তকে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বজনীন জ্ঞানের আধার বলিয়াছেন।

জাপানে ঠিক এই আদর্শ লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয় নাই। স্বদেশপ্রীতি ও জাতিপ্রেম নবীন শিক্ষার্থীর তরুণ হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া দেওয়াই সেখানকার মুখ্যতম উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের কল্যাণ বিধানের জন্যই কলা ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা, জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্যই শিক্ষার প্রচার। জাপানের জাতীয় জীবনের নব অভ্যুত্থানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শই শ্রেষ্ঠ সম্পৎ।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আজ নূতন নয়। ভারতবর্ষ শিক্ষাক্ষেত্র। প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষির পবিত্র আশ্রম যুগ যুগ ধরিয়া

শিক্ষা বিতরণ করিয়াছে। সেদিনকার নালন্দা, তক্ষশীলা, নবদ্বীপ ও বারাণসীর বিদ্যার গৌরবের কথা আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষুন্ন রহিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ও কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান ভারতে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র আদর্শ পুনর্জীবিত করিতে সচেষ্ট। Romain Rolland তাঁহার রচিত "মহাত্মা গান্ধী" নামক পুস্তকে এই বিষয়ের স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। Earnest Rhys তাঁহার "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে প্রাচীনকালের ঋষিদিগের আশ্রমবিদ্যালয় কবির চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে।

আচার্য্যই প্রাচীন আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। অন্তেবাসী গুরুর সান্নিধ্যে বাস করিয়া দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে আচার্য্যদেবের মহানাদর্শে চরিত্র গঠন করিবার সুযোগ পাইত। কেবলমাত্র জ্ঞান বিতরণ করাই গুরুর একমাত্র কার্য্য ছিল না। শিষ্যের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করাই আচার্য্যের প্রধান কর্ম্ম। শিষ্যেরও জ্ঞানার্জ্জন করিবার জন্য উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মচারী দেহ মন ও আত্মার শুচিতা রক্ষা করিয়া একাগ্রচিত্তে গুরুর সেবা করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিত। William Hamilton তাঁহার Oxford as it might be পুস্তকে লিখিয়াছেন—"A University should supply competent and exclude incompetent instructors: should place conspicuously before the eyes of the students high living examples of erudition and ability." ভারতবর্ষের আর সে দিন নাই? সে গুরু নাই, সে শিষ্য নাই, সে আশ্রম নাই, শিক্ষার সে আদর্শও নাই।

দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। বিদেশী আদর্শে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইলে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না, দেশের কল্যাণও সাধিত হইবে না। ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই, হঠাৎ বিদেশী আদর্শে পথ ধরিলে সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড ও নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের জাতীয় আদর্শের উপলব্ধির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার শিক্ষা প্রদান করা বিধেয়। এপর্য্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বিষয় অবহেলা করা হইয়াছে;—(১) ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চ্চা, (২) শারীরিক শিক্ষা এবং (৩) ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা। টোকিওর Imperial Universityতে কলাশাখার ৩৭ জন অধ্যাপকের ভিতর তিন জন জাপানী সাহিত্যের জন্য, তিন জন জাপানের ইতিহাসের জন্য, তিন জন চীনের দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাসের জন্য এবং একজন কোরিয়ার ইতিহাসের জন্য নিযুক্ত।

জাপানের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় সাহিত্যের সাধনা, প্রাচীন ভারতের গৌরবমণ্ডিত ইতিহাসের অমরকাহিনীর আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবোদ্দীপক কবিত্ব, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, কলা ও স্থাপত্য শিল্প উপেক্ষণীয় নহে। অতীতকে উপেক্ষার চক্ষে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান গড়িয়া উঠিতে পারে না। অতীতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠা। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালীকে আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়াছেন। শুধু বাঙ্গালী নহে, ভারতবাসী আত্মবিস্মৃত জাতি।

নানা কারণে ইংরাজিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাদ দেওয়া চলে না। জাপানের মত ইংরাজিকে আমরা অনায়াসে compulsory second language করিতে পারি। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানচর্চ্চা ও শিল্পশিক্ষা (Technical education) ভিন্ন আমাদের দেশের প্রকৃত মঙ্গলের দ্বিতীয় উপায় নাই বলা বাহুল্যমাত্র।

শারীরিক শিক্ষা আমাদের দেশে কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক হইলে চলিবে না। শারীরিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদিগের শীর্ণ শরীর, ভগ্নদেহ ও স্ফূর্ত্তিহীন প্রাণ দেখিয়া অশ্রু রোধ করা কঠিন। আমরা দিন দিন ক্ষীণায়ু হইতেছি। এ মহাজাতি ধ্বংসের পথেরই পথিক। এই আশাহীন, স্বাস্থ্যহীন, নির্বীর্য্য জাতির নিরানন্দ শঙ্কাকুল ব্যথিত প্রাণের ভিতর শক্তির সঞ্চার করিতে না পারিলে এ জাতির ভরসা কোথায়?

বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে শুধু জ্ঞানার্জ্জন করা আমাদের দেশে সম্ভবপর নহে।

ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষাকে এড়াইয়া চলিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ভারতবর্ষে যুগে যুগে কত মহাপুরুষ জীবনের জটিল সমস্যা পূরণ করিবার জন্য, সত্যকে সহজ ও সুন্দর করিয়া প্রকাশিত করিবার জন্য অবতীর্ণ। ভারতবর্ষ জননীর মত আপনার স্নেহ-সুশীতল ক্রোড়ে আপাতবিরোধী কত ধর্ম্মকে পরম আদরে স্থান দিয়াছেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা না হওয়ার কোনই কারণ নাই। শ্রদ্ধার সহিত কোরাণ বা পুরাণ পড়িয়া হিন্দুমুসলমানের বিদ্বেষ ভাব কমিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

নীতিশিক্ষার অভাবে আমাদের শিক্ষা কতদূর পর্য্যন্ত নামিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ অনেকবারই বলিয়াছেন, "Godless soul-killing education"। গত মহাসমরের পর বোধ হয় আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না যে, কেবলমাত্র শিক্ষার দোষেই দুর্নীতির প্লাবন সমস্ত জগতময় বহিয়া যাইতেছে। আমরা কেবলই চাহিতেছি। এ কামনার অন্ত কোথায়? আমাদের শিক্ষা আমাদের সংস্কার কেবলই ভোগের ইন্ধন জোগাড় করিতেছে। সুখ নাই—শান্তি নাই—তৃপ্তি নাই, কেবল কামনা—কেবল ভোগেচ্ছা; এই ত বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ভয়াবহ পরিণাম।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটা দোষ এই যে, আমরা পরীক্ষার উপরেই বেশী আস্থা স্থাপন করি। ফলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট হইতে কেবলমাত্র মুখস্থ করা পুঁথিগত বিদ্যা পাই। জনৈক ইংরাজ শিক্ষাসংস্কারক বলিয়াছেন—"We are an over-examined people; the bloom of originality is too often crushed from an original mind by our Examination system." আমাদের দেশের নিকট অবশ্য এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য; তবে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আপাততঃ পরীক্ষাপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ পরীক্ষা জ্ঞানের কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিমাপক। শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষার উপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহাকে কেবল পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

ভারতবর্ষ যদি সভ্য জগতের ভিতর আপনার হৃত আসন গ্রহণ করিয়া অক্ষুণ্ণ প্রভাবে আপনার গৌরবের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, জ্ঞানে বিদ্যায় শক্তিতে আবার যদি ভারত জাগিয়া উঠিতে চাহে, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। স্মৃতির কঙ্কাল হয়ত আবার সঞ্জীবিত হইবে। ভোগের মহাযজ্ঞের মধ্যে হয়ত আবার শান্তির অমৃত উৎস অফুরন্ত ধারায় বহিয়া যাইবে।

———

ত্রিকলিঙ্গ সোমবংশের অভ্যুত্থান।

(শ্রীব্রজবন্ধু দাস এম-এ)

এই প্রবন্ধের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা উচিত যে মাদলা পঞ্জিকাতে কেশরী নামে পরিচিত বংশকে আমি এখানে ত্রিকলিঙ্গ সোমবংশ নামে অভিহিত করিয়াছি। কারণ উক্ত বংশের রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে যে সকল শিলালিপি বা তাম্রলিপি মিলিয়াছে, সে সকলের মধ্যে তাঁহারা কোনও স্থানে উৎকলের বা উড্রের বা উড়িষ্যার রাজারূপে উল্লিখিত হন নাই। তাঁহারা সকলেই ত্রিকলিঙ্গাধিপতি নামে বিদিত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ সময়ে সময়ে কোশলেন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছিলেন এবং কয়েকজন রাজা সময় সময় কেশরী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহারা সোমবংশ নামে আখ্যাত হইতে গৌরব অনুভব করিতেন। এই নিমিত্ত উড়িষ্যার কেশরী বংশের রাজাদের ত্রিকলিঙ্গ সোমবংশের রাজা নামে অভিহিত করা সমীচীন হইবে। কারণ তাঁহাদের রাজত্বকালে উড্র বা উৎকল নাম এ দেশে প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা নিজে সে সকল নাম ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা সোমকুলতিলক, তাঁহারা যুদ্ধে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিরূপাক্ষ কর, বি-এল, এই ত্রিকলিঙ্গ সোমবংশের কথা অনেক গবেষণা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমিও এই

সংখ্যা ও পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে উক্ত বংশের সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিব।

এই বংশের আলোচনা করিতে গেলে মাদলা পঞ্জিকার অনেক ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে। মাদলা পঞ্জিকার লেখকগণ পুরাণের সহিত ইতিহাসকে মিলিত করিয়া একটা বড় ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাভারতের পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়কে উড়িষ্যার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কত পৌরাণিক নাম দিয়া তাঁহাদের বহুবর্ষব্যাপী রাজত্বকাল বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইহা দ্বারা তাঁহারা যযাতি কেশরীর কাল ৪৪৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়া ধরিয়াছেন। কেশরী বংশের যে বংশাবলী মাদলা-পঞ্জিকাতে আছে তাহা কাল্পনিক। পঞ্জিকা-লেখকগণ যাহা মনে রাখিয়াছিলেন তাহাই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। উড়িয়া ভাষা ৪৪৭ খৃষ্টাব্দে সৃষ্ট হয় নাই। সে সময়ে পুরীর বৃহৎ মন্দিরের চিহ্নও ছিল না। চোলগঙ্গদেবের রাজত্বকালে যখন পুরীর বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত হয় তখন উড়িয়া ভাষার বিবরণ সকল লিপিবদ্ধ হওয়া সম্ভব। অতএব মাদলা-পঞ্জিকার লেখকগণের ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের বিবরণ ততদূর বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বর্ত্তমানে যে সকল তাম্রলিপি ঐতিহাসিকগণের হস্তগত হইয়াছে তাহা দেখিয়া এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদানগুলির সাহায্যে উক্ত মাদলা-পঞ্জিকার বিবরণকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অনেকে আবার সোমবংশের তাম্রলিপির লিপিগুলি দেখিয়া উক্ত সোম বা কেশরী বংশের রাজাদিগকে একাদশ শতাব্দীর দিকে টানিয়া আনিয়াছেন। অতএব তাঁহারাও মাদলা পঞ্জিকাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অবশ্য মাদলা-পঞ্জিকাতে শতাব্দী ও সংবৎ সম্বন্ধে ব্যতিক্রম থাকিতে পারে, কিন্তু তাম্রলিপির নামের সহিত মাদলা পঞ্জিকায় লিখিত অনেক নামের সামঞ্জস্য দেখা যায়। এই সকল দেখিয়া মাদলা-পঞ্জিকাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। মাদলা পঞ্জিকায় লিখিত বিষয়ের স্বতন্ত্র আলোচনা আবশ্যক। তাহা না হইলে এ প্রবন্ধ সহজবোধ্য হইবে না।

কটকের চৌদ্বার, পাটনা ও সোণপুর রাজ্যে প্রাপ্ত কতকগুলি তাম্রলিপি ও রায়পুর জিলার পূর্ব্ব ভাগস্থ উড়িয়াভাষী অঞ্চল অর্থাৎ শ্রীপুর, খড়িয়াল প্রভৃতি স্থানে সংগৃহীত কয়েকটী তাম্রশাসন ও শিলালিপির উপরে ত্রিকলিঙ্গ-সোমবংশের ইতিহাস গঠন করিতে হইবে। নাগপুরের যাদুঘরে সংরক্ষিত কয়েকটী তাম্রশাসন একত্র পাঠ করিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়া আমরা নিম্নলিখিত সোমবংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। (Epigraphica Indica Vol XI.)

উপায়ন
- ইন্দ্রবল
  - নন্নদেব
  - চন্দ্রগুপ্ত
    - হর্ষগুপ্ত
      - বালার্জ্জুন মহাশিব গুপ্ত
        - মহাভব গুপ্ত
          - শিব গুপ্ত
            - জনমেজয় মহাভব গুপ্ত
              - যযাতি মহাশিব গুপ্ত
                - ভীমরথ মহাভব গুপ্ত
      - রণকেশরী
- ভবদেব ও রণকেশরী

রায়পুর জেলার খারোড় নামক স্থানে লক্ষেশ্বর দেবালয়ে একটী তাম্রলিপি আছে; তাহাতে সোমবংশের ইন্দ্রবল ও ঈশানদেবের নাম পাওয়া যায়; এবং বালার্জ্জুন শিবগুপ্তের মাতা লক্ষেশ্বর দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন জানা যায়। অতএব শিবগুপ্ত বংশের শ্রীপুর ইন্দ্রবল নিশ্চয় খারোড় লিখিত ইন্দ্রবল হইবেন। মধ্যপ্রদেশস্থ একটী বৌদ্ধ লেখা নাগপুর যাদুঘরে রক্ষিত আছে; তাহাতে লেখা আছে যে সূর্য্য ঘোষ নামক এক বৌদ্ধ রাজা বারদা নদীতটস্থ কোশল রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার এক পুত্র পর্ব্বত হইতে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি বুদ্ধদেবের এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পর পাণ্ডুবংশীয় উদায়ন উক্ত কোশল রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ছিল এবং ভবদেব রণকেশরী বা চিন্তাদুর্গ নামেও তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহাশিব তিবর দেব যে পাণ্ডুবংশ-সম্ভূত ও কোশলের রাজা ছিলেন তাহা রাজিম নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায়। (Asiatic Researches XV499)

ফুল-ঝুরের বালোড়া নামক স্থানের উড়িয়াভাষী অঞ্চলে মহাশিব তিবর দেবের এক লিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই লিপিতে মহাশিব তিবরদেব পাণ্ডুবংশ-সম্ভূত

নন্নদেবের পুত্র ও ইন্দ্রবলের পৌত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (Epigraphica Indica Vol. VII. P. 106)। শ্রীপুরের গন্ধেশ্বর মন্দিরের এক লিপি হইতে জানা যায় যে, শশধর-বংশের উদায়নের পুত্র নন্নদেব এবং নন্নদেবের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র হর্ষগুপ্ত ও হর্ষগুপ্তের পুত্র বালার্জ্জুন শিবগুপ্ত ছিলেন,(Indian Antiquary XVIII). শ্রীপুরের লক্ষ্মণমন্দিরে সোমবংশের হর্ষগুপ্ত, বালার্জ্জুন, মহাশিব গুপ্ত, রণকেশরী প্রভৃতি নামগুলি মিলিয়াছে এবং হর্ষগুপ্ত মগধ সূর্য্যবর্ম্মার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন দেখা যায়। অরঙ্গ নামক স্থানে এক শিলালিপিতেও রণকেশরী নামটি দেখা যায়। রণকেশরীকে মহাশিব গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। (Cousen's progress report 1904 and E. I XI)।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলি হইতে আমরা উদায়ন হইতে বালার্জ্জুন মহাশিব গুপ্ত পর্য্যন্ত দশজন রাজার নাম পাই। সূর্য্য ঘোষ বৌদ্ধ রাজা ছিলেন এবং কোশলের চান্দা জেলাতে তাঁহার রাজধানী ছিল। উদায়ন হইতে শ্রীপুর রাজধানীতে পরিণত হইল। এবং তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদায়ন হইতে তাঁহারা পাণ্ডুবংশ বা শশধর বংশ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তাঁহারা মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠভ্রাতা পাণ্ডুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনিও চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। অতএব পাণ্ডুবংশ ও শশধরবংশ সোমবংশে পরিণত হইল। এই জন্যই বোধ হয় মাদলা পঞ্জিকার লেখকগণ পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়কে উড়িষ্যার রাজবংশের বংশধর রূপে পরিচিত করাইয়া থাকিবেন। হুয়েন সাংএর সময়ে যে কোশল রাজধানীর উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা চান্দা জেলার প্রতি প্রযোজ্য। সমুদ্রগুপ্তের কোশল আক্রমণের সময়ে শ্রীপুরে এই বংশের অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই চলে। কারণ শ্রীপুর অঞ্চল মহাকান্তারের অংশ ছিল এবং তথায় ব্যাঘ্ররাজ রাজত্ব করিত। পল্লবরাজ পল্লব মল্লের সময়ে বোধ হয় এই শ্রীপুরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে শবরগণ রাজত্ব করিত। সেই শবরবংশের পর এই সোমবংশ সেইস্থান অধিকার করেন। হর্ষবর্দ্ধন কোডংদ জয় করিবার সময়ে বোধ হয় কোশলও হস্তগত করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে বালার্জ্জুন মহাশিব গুপ্ত রাজত্ব করিতেন ইহাই খুব সম্ভব।

আমরা কটক, চউদ্বার, পাটনা ও সোণপুর অঞ্চলে যে সকল তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে শিবগুপ্ত, জনমেজয় মহাভবগুপ্ত, যযাতি মহাশিবগুপ্ত ও ভীমরথ মহাভব গুপ্ত এই চারি পুরুষের নাম দেখিতে পাই। এক পুরুষ মহাভব গুপ্ত ও অন্য পুরুষ মহাশিব গুপ্ত উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। আজকালও বামড়াতে দুই পুরুষে ও চারিপুরুষে নামের পুনরাবর্ত্তন হয়। বালার্জ্জুন মহাশিব গুপ্ত একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার পর শরভপুরের রাজারা শ্রীপুর হইতে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করেন। এইজন্য তাঁহার পুত্র মহাভব গুপ্ত একজন দুর্ব্বল রাজা ছিলেন এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় প্রমাদজনক হইবে না। তিনি ও তাঁহার পুত্র শিবগুপ্ত শ্রীপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া পূর্ব্বদিকে রাজ্য অন্বেষণে বাহির হইলেন। সে সময়ে কলিঙ্গদেশের উত্তরাংশে আধুনিক উৎকলে অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। অনুন্নত জাতিসকল গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া নিজে নিজে শাসন করিত এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সকলের বিশ্বাস ছিল। শিবগুপ্ত পাটনা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জনমেজয় মহাভব গুপ্ত ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে রাজ্য বিস্তার করিলেন, তাঁহার পরে তাঁহার পুত্র যযাতি মহাশিব গুপ্ত ও তাঁহার পুত্র ভীমরথ মহাভব গুপ্ত প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে লিখিত উদ্যোত কেশরী রাজদেব এই বংশের এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কথা পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব। বিজয় কটকের প্রদত্ত বিদয়রাজদেবের নবম শতাব্দীর এক তাম্রলিপি আছে। তিনি কেশরী—কেট্টা নামক স্থানে ভূমিদান করিয়াছিলেন। (Ephigraphica Indica Vol III).

এই যে সকল বিবরণ দেওয়া গেল তাহাতে শশধরকে শবর বলিয়া কয়েকজন ঐতিহাসিক পাঠ করিয়াছেন। উদায়নের একজন উত্তরাধিকারীর নাম চিন্তাদুর্গ ভবদেব রণকেশরী ছিল। অতএব কেশরীবংশের বিষয় তাঁহাদের অবিদিত ছিল না; কারণ বালার্জ্জুন মহাশিব গুপ্তের নামও রণকেশরী ছিল। এই সোমবংশীয় রাজন্যবর্গের সম্বলপুরের শরভবংশীয় রাজগণ প্রতিদ্বন্দী ছিলেন। শরভ সিংহজাতীয় এক পরাক্রমশালী জন্তু। এইজন্যই বোধ হয় শরভবংশের প্রতিদ্বন্দ্বী সোমবংশীয় রাজগণ কেশরী বা সিংহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা শশধরকে শবর বলিয়া পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সোমবংশীয় রাজাদিগকে ছত্রিশগড়ের আদিম অনার্য্য রাজবংশরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা মগধ বর্ম্মণগণের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। কারণ অন্যান্য লিপিতে :পাণ্ডুবংশের নাম দেখিয়া শশধর অর্থ বুঝাই সমীচীন হইবে। তাহার পর তাঁহারা নিজে নিজেদের শবর-আখ্যাই বা কেন দিবেন? তাঁহারা মগধের গুপ্তবংশের এক শাখা হইতে পারেন।

এই বংশের রাজত্বকাল নিরূপণ করা বড় কষ্টসাধ্য।

তবে এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের পুত্র হর্ষগুপ্ত মগধের মৌখর-বর্ম্ম-বংশীয় সূর্য্যবর্ম্মার কন্যা বাসতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মগধের মৌখর বংশের রাজ্য আধুনিক শোননদীর উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত ছিল ও বুদ্ধগয়ার নিকটস্থ একস্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। উক্ত বংশের কতকগুলি তাম্রশাসন অধুনা ঐতিহাসিকদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে সূর্য্যবর্ম্মা ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়; কারণ সূর্য্যবর্ম্মার পিতার রাজত্বকাল ৫৫৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া উহাতে লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক রাজার আনুপাতিক রাজত্ব কাল ১৫ বৎসর করিয়া ধরিলে আমরা ত্রিকলিঙ্গ দেশে জনমেজয় মহাভবগুপ্তের রাজত্বকাল ৬৭৪ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি (Indian Antiquary Vol 46)। অতএব এই সোম-বংশীয় কোশলগুপ্তের যে রাজা ত্রিকলিঙ্গের প্রথম রাজা হইয়াছিলেন তিনি কলিঙ্গগঙ্গা বংশের প্রথম রাজার ঠিক সমসাময়িক ছিলেন। আমি এই বিষয়ের সূচনা 'কলিঙ্গ গঙ্গাবংশের উৎপত্তি' নামক প্রবন্ধে দিয়াছি। যেরূপ কলিঙ্গ গঙ্গাগণ প্রথমে দক্ষিণ কলিঙ্গের রাজত্ব করিয়াছিলেন সেইরূপ এই সোমবংশীয় রাজগণ মহা-কোশলের এক অংশ পশ্চিম কলিঙ্গে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। গঙ্গাগণের যেরূপ বংশধারা-তটস্থ মুখলিঙ্গ-নগরী কটক রাজধানী ছিল, সেইরূপ সোমবংশীয়দের প্রধান নগর মহানদীতটস্থ শ্রীপুর নগরে অবস্থিত ছিল। এই শ্রীপুর বর্ত্তমানে খড়িয়ালের পশ্চিমস্থ রাজিম নামে পরিচিত।

উদায়ন, মহা কোশলের আদিম অধিবাসী শবর-দিগের বংশধর হউন অথবা উত্তর ভারতাগত ক্ষত্রিয়ই হউন, তাঁহারা যে মগধদেশের মৌখরগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের বংশমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এ বিষয় অবগত হওয়া যায়। এবং মগধ-মৌখর বর্ম্মগণের সহিত মগধ, কান্যকুব্জ, উজ্জয়িনীর গুপ্তদিগেরও বৈবাহিক সম্পর্ক হইয়াছিল। আর একটি কথা এই যে, মগধের মৌখর বর্ম্মণ বংশের বাশিষ্ঠীশক্তিবর্ম্মণ, উমাবর্ম্মণ, চন্দ্রবর্ম্মণ ও নন্দপ্রভঞ্জন বর্ম্মণ প্রভৃতি কলিঙ্গ-গঙ্গাবংশের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশের পিঠাপুর, সিংহপুর, সরপল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব কলিঙ্গদেশের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশের সহিত পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মগধদেশের মৌখর বর্ম্মণগণের সম্বন্ধ ছিল। এক সময়ে মগধের ঈশান বর্ম্মাও অন্ধ্র, গৌড় ও শুলিক রাজ্য জয় করিয়া-ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এই শুলিক রাজাকে উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চলের স্তম্ভবংশের রাজধানীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বোধ-রাজ্যান্তর্গত শালকী ও মহানদীর সঙ্গমস্থলে তাঁহাদের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রকাশ (Vide Hawah Inscription of Indian Antiquary of 1917.)।

আমরা এই সোমবংশের বিবরণে দেখিতে পাই যে পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ যথাক্রমে মহাভব গুপ্ত ও মহাশিব গুপ্ত নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। জনমেজয় মহাভব গুপ্তের পিতার নাম ছিল শিবগুপ্ত ও তাঁহার উপাধি ছিল 'কেবল কোশলেন্দ্র'। ইহাতে এই-রূপই অনুমান হয় যে শিবগুপ্ত কলিঙ্গ অথবা উৎকলের কোনও অংশ অধিকার করেন নাই; কিন্তু তাঁহার পুত্রের নামের পূর্ব্বে "মহা" শব্দটি যোগ করা হইল এবং তিনি ত্রিকলিঙ্গাধিপতি ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আমরা জনমেজয় মহাভব গুপ্তের অন্যান্য তাম্রশাসন-গুলি পাঠ করিলে জানিতে পারিব যে তিনি বিনীতপুর, আরামবন ও বিজয়কটক প্রভৃতিস্থানে যেগুলি দান করিয়াছিলেন, সেগুলি মহানদীতীরে বর্ত্তমান আছে। তাঁহার পুত্র যযাতি মহাশিব গুপ্তের শাসনকাল ৮০০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। তিনি মহা-নদীকূলস্থিত যযাতিপুর নামক স্থানে তাম্রশাসন দান করিয়াছেন।

অনেকে অনুমান করেন যে যযাতি কেশরী মগধ হইতে বৈতরণী নদীকূলে আসিয়া যযাতিপুরে প্রবেশ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে সমস্ত তাম্রলিপি নিস্তব্ধ। যে সকল তাম্রলিপিতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে সেগুলিতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই মহানদীতীরে যযাতি নগর অবস্থিত ছিল। অতএব তাহা কখনই যাজপুর হইতে পারে না। শ্রীপুর হইতে জনমেজয় ও যযাতি মহানদীর কূল ধরিয়া গড়জাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কটক চউ-দ্বারে প্রবেশ করেন ও সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। অনন্তর তাঁহারা যাজপুরে শাসনপীঠ স্থাপন করার পর ব্রাহ্মণশাসন সকল বসাইয়া থাকিবেন বা যজ্ঞ করাইয়া থাকিবেন। তাঁহাদের অনেকগুলি দানশাসন বিজয়কটকগণের প্রদত্ত। এ গুলিকে আজকাল "কালর" ক্যাম্পের (Camp) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহারা পশ্চিমদিকে অর্থাৎ সম্বলপুর অঞ্চলে ক্রমশঃ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিজিত স্থানগুলিতে তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। অবশেষে আধুনিক কটকের নিকটে প্রবেশ করিয়া সেই রাজত্ব সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-স্মৃতিসভা।

'আশুতোষ কলেজের' ছাত্রবর্গের যত্ন ও চেষ্টায় ভবানীপুর 'সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে' গত ২১ শে চৈত্র

শনিবার পূজ্যপাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিসভার একটী অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী লিখিয়া কিছু বলিবেন স্থির ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার বক্তব্য বিষয় আর একজন পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল "হিন্দুমেলায়" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্রব হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার নাটক ও প্রহসন রচনার বিশেষত্ব দেখান এবং সাহিত্যরচনার দিক দিয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। অতঃপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিনয় সম্বন্ধে জ্যোতিবাবুর একখানি পুরাতন পত্র অবলম্বনে কয়েকটী কথা বলেন এবং জ্যোতিবাবুর অমায়িক ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় দেন। পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র বাবু, জ্যোতি বাবুর হৃদয়ের দিক দিয়া কয়েকটি কথা বলিয়া আসন গ্রহণ করিলে শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় একটী লিখিত প্রস্তাব পাঠ করেন। আমরা নিম্নে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের পঠিত পত্রাংশ ও চিন্তামণি বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ করিলাম। এই উপলক্ষে সমাজ-গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বিশেষভাবে জ্যোতি বাবুর গুণাবলী আলোচনা করিলে সভাভঙ্গ হয়।

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্রাংশ।

[যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছেলেদের অভিনয়-সংবাদ শুনিয়া পূজ্যপাদ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অবনীন্দ্র বাবুকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন। তঃ সং]

"আবার জোড়াসাঁকোয় অভিনয় আদি নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ আরম্ভ হয়েছে শুনে খুসী হলুম। আমাদের সেকালের কথা মনে পড়ে। আমাদের পালা ফুরিয়েছে, এখন আমাদের নাতি-নাত্নীদের পালা। আমাদের জোড়াসাঁকোর হল্‌টা ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ ঘরে আমাদের তিন পুরুষ অভিনয় করে আসছে। প্রথমে আমাদের কাকাদের আমল—তখন মেজকাকামশায়ের রচিত 'বাবুবিলাসের যাত্রা' ঐ ঘরে হয়; আমার বয়স তখন চার-পাঁচ বৎসর হবে। আমার বেশ মনে পড়ে, হল-ঘরে জাজিম্‌পাতা একটা গদির উপরে গেদ্দা ঠেসান দিয়ে মেজকাকা বসেছেন, তাঁর সম্মুখে অভিনয় হচ্ছে—ঘরের শেষ প্রান্তে একটা পর্দ্দা ফেলা, তার পাশের ঘরটা সাজঘর; আমরা ছেলেরা সব উঁকি দিয়ে দেখতুম, হলঘরের প্রথম দরজার সম্মুখে 'বাবু' একটা চৌকিতে উপবিষ্ট; তাঁর পিছনে ঈশ্বর বাবু হরকরার সাজে দাঁড়িয়ে, দিনু ঘোষাল 'বাবু' সাজতো। আর নবীন বাবু ঢাল-তলোয়ার হাতে দরোয়ান সাজতেন, অনেক সং আসতো। একটা সং আমার মনে আছে—রামলাল গাঙ্গুলী পেট ফুলিয়ে চুণ মেখে পিছনে ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়ে নৃত্য করতেন, তখন যে গানটা হতো তার একটা টুকরো মনে আছে—

"মুখে তার আঁকা-জোখা
পিছনে ময়ূরের পাখা"

তার পর আমাদের আমল—হাঁ, হেমদাদার সামনে অভিনয় করতে হবে মনে করে আমার যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল ... উপরোধে অনুরোধে শেষে সকলেই আসরে নাবলেন—সে এক অসাধ্য সাধন! এখন আমার নাতি-নাত্নীরা এই ঘরেই আবার অভিনয় করছে!

প্রতিভার বিকাশ।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

অবিচ্ছিন্ন ভাবে চারি পুরুষ ধরিয়া প্রতিভার বিকাশ প্রায়ই নয়নগোচর হয় না। বংশপরম্পরাক্রমে প্রতিভা আপনা হইতেই ম্লান হইয়া আইসে। কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথের বংশে প্রতিভা বিকাশের যে পরিচয় প্রাপ্ত হই, তাহা জগতে নিতান্তই দুর্লভ। দ্বারকানাথ অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রতিভার বিকাশ বৈষয়িক ব্যাপারে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন প্রভূত সম্পত্তি অর্জ্জনে তাঁহার সেই প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই। উহা বিভিন্ন মুখে বিকশিত হইয়াছিল। মেডিকেলকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, ছাত্রেরা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে সঙ্কুচিত, দ্বারকানাথ তাঁহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিতেছেন। 'মেটকাফ হল' প্রতিষ্ঠিত হইল, অর্থদানে তিনি উহাকে সম্পদশালী করিতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের দেহাবসানে ব্রাহ্মসমাজ মুমূর্ষু দশায় উপনীত, দ্বারকানাথ আর্থিক সাহায্যদানে ইহার প্রাণরক্ষা করিতেছেন। কলিকাতা মহানগরী আবর্জ্জনারাশিতে পরিপূর্ণ, দ্বারকানাথ অগ্রসর হইয়া 'লটারি ফণ্ড'এর টাকা অবলম্বনে সংস্কার বিধান করিতেছেন। নিজের চেষ্টায় নিজের অধ্যবসায়ে আশিখানি Conservancy cart সর্ব্বপ্রথম ক্রয় করিয়া নগরীর কলঙ্ক মোচন করিতেছেন। সে সময়কার জমিদারবর্গ ইংরাজি আইন ও হিন্দু দায়াধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; নিজের প্রচেষ্টায় আইন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে পরামর্শ দান করিতেছেন। তাহার উপর তাঁহার নিজের রেশমের, নীলের, লবণের ও সুবিস্তৃত জমিদারীর কার্য্য চলিতেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। এক দিকে যেমন তাঁহার বিপুল অর্থাগম, অন্যদিকে সাধুকার্য্যে তাঁহার মুক্তহস্তে দান।

যেখানে প্রতিভা, আবার সেইখানেই মৌলিকতার পরিচয় আমরা পাই। প্রতিভার সঙ্গে মৌলিকতার ঘনিষ্ঠতম যোগ। দ্বারকানাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন,

দেশীয়গণদ্বারা Bank প্রতিষ্ঠার কথা কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু দ্বারকানাথ আপনার উদ্ভাবিনী প্রতিভা প্রভাবে Union Bank এর প্রতিষ্ঠা করিলেন। দশজন ইংরাজ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিলেন। Gordon সাহেব তাঁহার Private secretary ছিলেন। ইংরাজকে private secretary নিযুক্ত করিলে কার্য্যের যে বিলক্ষণ সুবিধা হইবে, তখন দেশীয় রাজন্য-বর্গেরও এ বোধ জাগ্রত হয় নাই। বিলাতে যাইবেন, গর্ডনসাহেব তাঁহার সঙ্গে। জ্ঞানের আলোকে স্বদেশকে ভাস্বর করিয়া তুলিতে হইবে, চারি জন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। সকলের ব্যয়ভার নিজস্কন্ধে। উহাঁদের মধ্যে গুডিভ চক্রবর্ত্তী চিকিৎসা বিদ্যাতে বিশেষ পারদর্শী হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজের জনৈক ডাক্তার হইয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ইংরাজি সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ফিরিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যালাভের জ্ঞানলাভের যে প্রেরণা আপনার বংশের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, চারি-পাঁচ পুরুষ হইতে চলিল সে প্রেরণার তরঙ্গ আজও চলিতেছে।" তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পিতা হইতে যে প্রতিভা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইলেন, সেই দুর্জ্জয় প্রতিভার ক্ষেত্র ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন, তাঁহার সংযম ও তাঁহার সেই বৈরাগ্য। প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মৌলিকতা তাঁহাতে জাগিয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজকে অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদানে তাঁহার সেই মৌলিকতার বিকাশ দেখিতে পাই।

অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়,: তেমনি দ্বিজেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ হইতে যে প্রতিভা লইয়া জন্মিলেন, তাহার ক্ষেত্র তাঁহার আদর্শ জীবন ও অপূর্ব্ব দর্শন-চর্চ্চা। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভা লইয়া অবতীর্ণ হইলেন, তাহার বিকাশক্ষেত্র কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও বিবিধ ললিতকলা। তাঁহাদের পরবর্ত্তী চতুর্থ বংশীয়গণের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ দেখিয়াছি বলেন্দ্রনাথের ভিতরে, দেখিতেছি সুধীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভিতরে। আরও দেখিয়াছি দ্বারকানাথের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্রের ভিতরে, দেখিতেছি গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথের ভিতরে—অপূর্ব্ব চিত্রাঙ্কনে।

প্রতিভা বন্ধ্যা নহে, প্রতিভা দিয়া যায়, প্রসব করে। জনসমাজকে সমুন্নত করে জ্ঞানের আলোকে—সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে—কর্ম্মঠভাবের প্রেরণায়। আজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি-সভায় আমরা মিলিয়াছি। আজ তাঁহারই সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা বলিব। পুত্রকন্যাকে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বিনয়ে ও সৌজন্যে গঠিত করিবার শক্তি ও নৈপুণ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। তিনি যেমন তাঁহাদের পাঠের সুব্যবস্থা করিয়া দিতেন, তাহার সঙ্গে প্রত্যেককে আবার গায়ক বিষ্ণু বাবুর নিকট সঙ্গীতশিক্ষা করিতে হইত। স্বর্গগত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও আমার পিতা ৺ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়ের নিকট নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ অভ্যাস করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত তিনি যখন নিজে বক্তৃতা দান করিতে যাইতেন, সঙ্গে দুই একটি পুত্রকে লইয়া যাইতেন। দেশভ্রমণে বাহির হইলেও দুই-একটি পুত্র সঙ্গে থাকিত। জমিদারী দেখিতে হইবে, এক-একটি পুত্রকে পর্য্যায়ক্রমে ভার দিতেন। তাঁহাদিগকে আরও উৎসাহিত করিবার কারণে পরিদর্শন জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতেন, নিয়মিতরূপে মফঃস্বলে পাঠাইতেন। তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্রের উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় দৃষ্টি রাখিতেন। মাঘোৎসবের সময় কোন কোন পুত্রকে বিশেষ বিশেষ ভার প্রদান করিতেন। মহর্ষির এমন একটি দৃঢ়তা ছিল যে তাঁহার আদেশের ব্যতিক্রম করে কার সাধ্য। "বাবা মহাশয় কি বলিবেন" এই ভয় পরিণত বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলের ভিতর দেখিয়াছি। তাহার উপর, মহর্ষিদেবের আদর্শ জীবন সকলের সম্মুখে। ইহার ফলে ঠাকুর-পরিবারের অনুরাগ—কাব্যালোচনায় ও কাব্য ও সঙ্গীত রচনায়; তাঁহাদের বিলাস—সঙ্গীতে ও অভিনয়ে। মহর্ষির বাটীর সঙ্গে আমার যোগ প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাস পাশা ক্রীড়ায় প্রায় কাহাকেও রত দেখি নাই বা তাকিয়ার ব্যূহ রচনা করিয়া আলস্যে কাহাকেও সময়াতিপাত করিতে নিরীক্ষণ করি নাই। গগন বাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখিয়াছি, কথোপকথনের ভিতরে তাঁহার ও ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথের তুলিকা বিভিন্ন চিত্রের উপর দিয়া অবিরাম চলিতেছে; মহর্ষির বাটীতেও কাব্যসাহিত্য লিখন-পঠনে সময় অতিবাহিত হইতেছে।

আমরা নিজে কালেজে যাহা পড়িয়াছিলাম তাহা বিস্মৃতির ভিতরে দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম, অনেক স্থলে তাহা নূতন ও দুর্ব্বোধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছি আলস্যের ভিতরে। এইরূপে আত্মবিস্মৃত জাতির জনসংখ্যা একভাবে বিবর্দ্ধিত করিতেছি। কিন্তু আজ একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের দিকে তাকাও। নিজ চেষ্টাতে ফরাসি ভাষা শিক্ষা করিলেন, উহা হইতে ভাবসম্পদ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষাকে সম্পদশালী করিতে সমুৎসুক। মারাট্টা ভাষা শিক্ষা করিয়া উহা হইতে

তিলকের সুপ্রকাণ্ড গীতারহস্য প্রৌঢ় জীবনে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলেন। সংস্কৃত ভাষায় নিজ চেষ্টাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ১৫।২০ খানি সংস্কৃত নাটক ভাষায় বাহির করিলেন। মার্কস্ অরিলিয়সের আত্মচিন্তা, এপিকৃটিটাসের উপদেশ, ভিক্টর কুজ্যাঁ হইতে সত্যং শিবং সুন্দরং অনুবাদ করিলেন। সেক্স্পিয়ারেরও কোন কোন নাটকের অনুবাদ বাহির করিলেন। বঙ্গ রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ বিধান-জন্য পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী প্রভৃতি রচনায় জনসাধারণের রুচির পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কত রচনা যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও ভারতীতে, প্রবাসী ও বঙ্গবাণীতে প্রকাশ পাইয়াছে কে তাহার সংখ্যা করিবে? কত সঙ্গীত তিনি খাঁটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হইতে ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মসঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীতের কৌলীন্যরক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। অচপল তাঁহার ভাষা, কৃতিত্বপূর্ণ তাঁহার অনুবাদ। চিত্রাঙ্কন, মস্তিষ্কতত্ত্ব (phrenology) তাঁহার সাধনার অন্য দিক।

তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি ও রুচি শোভনতম ছিল। রাঁচিস্থ আবাস-নিকেতন "শান্তিধাম" তাঁহার সৌন্দর্য্য অনুভূতির জীবন্ত সাক্ষী। অজাতশত্রু নির্জ্জনসাধক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিন্দাস্তুতির অতীত ছিলেন। হারমোনিয়ম বাদনে তিনি এদেশীয়দের পথপ্রদর্শক ছিলেন। স্বাদেশিকতা তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল। তিনি আপন উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রভাবে আকারমাত্রিক যে স্বরলিপি বাহির করিয়া গেলেন, তাহা বঙ্গের সর্ব্বজনস্বীকৃত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতরচনায় ও কণ্ঠসঙ্গীতে যে অপূর্ব্ব বিকাশ দেখাইলেন, তাহার মূলে রবিবাবুর প্রথম বয়সে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ যে বিশেষ ভাবে তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাব্যে নাটকে সঙ্গীতে দর্শনে প্রবন্ধে চিত্রাঙ্কনে আমাদিগকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে হইয়াছে একবার স্মরণ কর। যৌবনের বিকাশের অল্পদিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিপত্নীক হন। স্বাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অগ্রদূত হইয়া তিনি জাহাজ চালাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়, ঋণের মধ্যে তিনি ডুবিয়া পড়েন; কত আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ তাঁহাকে জর্জ্জরিত করে, হাঁপানি তাঁহাকে অবসন্ন করিয়া দেয়, কিন্তু সাহিত্য-সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক যে সাধনায় আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহার সেই সাধনার ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। পরিশেষে ৭৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে লেখনী তুলিয়া লইল। তিনি তাঁহার জীবনের সৌগন্ধে চারিদিক আমোদিত করিয়া আমাদের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইলেন। রাখিয়া গেলেন তাঁহার প্রতিভার দান—তাঁহার কর্ম্মঠ জীবনের অপূর্ব্ব প্রভাব—তাঁহার বিনয় ও সৌজন্যের অম্লান ছায়া।

Brahmo Dharma.

(Translated by Sm. Indira Debi B-A.)

CH. VII.

48. *Tamishwaranam etc.*

He is the ruler of the universe, the king of kings, the lord of all. His splendour knows no bounds. Whatsoever riches are possessed by whomsoever in this world, all are His; He is master over the masters of all riches; He is the Supreme Lord of all. He is lord of all the monarchs in this world, and also overlord of all deities that dwell in other spheres higher than this earth. In whatever sphere or portion of the universe there reside beings superior to human beings in wisdom, piety and love, they are known as deities; He is the supreme Deity of all such deities, the highest object of their worship, and the ruler of their destiny. He is the guardian of all guardians. He is higher than the highest, there is none above Him. To Him is due our service, to Him are due our hymns of praise; He is the object of our highest veneration and our deepest devotion.

49. *Na tasya karyam, etc.*

The body is a machine, a piece of work, the supreme spirit does not possess this machine-like body; He is not subject to any bodily mechanism, He is not the result of any work. All that is, is His work, He is the one and only cause; He has no body, neither has He any organs; yet does He see all and know all. He alone is the highest of all; there is none equal to Him,

none greater than He. He is the Creator of all things, all else is created. He is the King of this great universal kingdom, and all the rest are His subjects. He is our divine father, and we are all His children. He is our master, and we are all His servitors to command. Everything is subordinate to His laws, is being created by them, also by them destroyed. Whether it be the astronomers who gaze upon the skies, or the geologists who explore the depths of the earth, or the physiologists who discover the laws governing the human body, or the learned scientists who investigate the principles of matter, or the profound scholars who seek to know spiritual truths,—all, all combine to extol His wonderful and unthinkable might. Throughout the world we hear from them endless glorifications of His mighty power.

With Him the process of knowing is not like that of our knowledge of a particular subject, which is gained by successive stages of reasoning, after perceiving it by the senses. His manifestation of strength is not like our strength, which is expressed by the muscles of the body. He knows all by His own innate power, and accomplishes His beneficent designs by the force of His own will alone. In order to know anything, He is not obliged to depend on senses or suchlike mediators, neither does He need any other materials for manifesting His own power. Knowing and doing are part of His very nature. He, in whom these countless intelligent creatures have their origin, how wonderful is His wisdom; and He, by whom all these things have been created and have received their respective forces, how magnificent is His power.

50. *Na tasya kaschit etc.*

He is an eternal, featureless, birthless self-dependent and sublime spirit.

51. *Eshadevo etc.*

This Great God has created and made the universe, therefore is He the maker of the universe. He is the Great Spirit. He is not little, like created spirits. He exists as the life of life in the hearts of all men always. He is revealed to the intellect that is clear and free from doubt. Those who are able to seek and find Him, enjoy the ineffable bliss of communion with Him for evermore.

52. *Tandurdarsham etc.*

He is difficult of comprehension, he whose mind is overpowered by worldly illusions cannot possibly come to know Him. Such an one may study philosophy or study logic, yet his doubts are never destroyed, his intellect is never satisfied. The truth of truths appears to him like a shadow. As fire is latent in the heart of wood, so is He latent and hidden deep in the heart of all things; that Supreme Deity is readily revealed to the clear intellect of the pure in spirit who are devoted to Him, like a bright fire issuing from burning wood. He is the inmost soul of our soul, He dwells forever in our souls, He pervades the sky also. He is in the mountain caves, on the snowy peaks of Kailas, in the spreading forest fire, in the fierce sea-waves, in lonely, inaccessible and dangerous spots does He dwell, and is eternal. He is our immediate father, He is our remote forefather. The calm in spirit, knowing that incomprehensible Supreme Being through spiritual communion, are set free from grief and joy. Spiritual communion means uniting the created soul with the supreme soul. When by spiritual communion my will is united with His will, my intellect is satisfied with the vision of His true, good and beautiful aspect; then does the heart offer Him the gift of love, and

become freed from the grief and joy which result from the desire for worldly things. The more my will is united with His, the more my wisdom is united with His, the more my love is united with His,—the deeper will be my communion with Him, and the purer will I become by realising His holy presence. Such is the communion that enables us to know Him, such is the communion that gives us strength to obey His holy will, such communion leads to heaven, such communion leads to salvation.

53. *Pranasya pranamata etc.*

They know Him for certain, who know Him as the living cause and support of all things.

54. *Ekadhaivanudrashtavya etc.*

He is one alone and incomparable; nothing exists with which He can be compared. He is distinct from all things, He is above the skies, and dwelling within the skies He regulates all that happens.

55. *Yasmadarbak etc.*

All those beings dwelling in other spheres, who are superior to men in wisdom, piety and love, do constantly worship the Supreme Lord. As these deities worship Parabrahma, so are human beings also entitled to worship Him; this is no mean honour and privilege for us.

56. *Sarvasya vashi etc.*

Each of us is bound by the laws which God has imposed upon him; none can transgress His commands. He is lord of all, ruler of all, master of all. The condition of men is liable to change for better or worse according to their good or evil deeds, but for Him their is no possibility of such change. His nature is so perfect that it cannot possibly be bettered, and so inalterable that it can never be lowered by any change.

57. *Esha sarveshwara etc.*

The Great God who protects His subjects, governs His universal kingdom with such well-established laws, that there is no chance of its ever being destroyed by any reversal. That Divine Being upholds all that is, like a bridge, to prevent the destruction of human beings.

58. *Asmin dyauh Prithivi etc.*

He is the guardian and protector of all. Know Him, and renounce all other converse. Transgress Him not in thought or word or deed, give thyself up to Him alone; thus wilt thou gain immortality, freed from sin and suffering and illusion. He is like unto a bridgeway of the Eternal.

59. *Na jayate mriyate va etc.*

All this that is, has its origin in that supreme spirit, who is immune from the changes of life and death, free from all error and delusion, pure and undefiled; but He Himself has not become anything. He has not transformed Himself into any substance as milk is transformed into curds, clay into pots, and gold into earrings. Neither is this universe an illusion based upon Him, as a rope is taken for a snake, a mirage is taken for water, and mother-of-pearl is mistaken for silver. He has created this universe, it is something separate from Him. He Himself has become neither matter nor spirit. He is to be served and worshipped, and we are all His servitors and worshippers.

60. *Yadarchimad etc.*

Beloved, do not separate your soul from the supreme soul within all, let it not be detached from Him and make you sorrowful; but purify and take it to Him, concentrate your mind and heart and with it pierce the supreme soul and enjoy the ineffable bliss of spiritual communion.

61. *Pranavodhanuh etc.*

Pranava means "Om." Om means Creator

Preserver and Destroyer in one; it is a synonym of the Supreme Spirit. The finite spirit has been likened to an arrow, and the sound Om has been likened to a bow, in order to explain that, as it is necessary to use a bow in order to aim at a particular object, so in orde1 to approach the finite spirit to the target Brahma, the sound which signifies Him is of immediate benefit. He whose soul has pierced and entered the target that is Brahma, he knows that, as his soul is covered by Para-brahma, so is the whole universe covered by Him.

62. *Same shuchau etc.*

It is meet to sit in prayer in a place such as ennobles the mind, and facilitates the communion of the soul with the Holy One. In an evil-smelling, hot, dirty and impure spot, the mind becomes tainted and the soul cannot properly concentrate itself upon God. A spot that is secluded, holy, clean, calm and smooth, where there is pure water, where there are no disturbing winds, where the sweet song of birds is heard, and where there are no objects inimical to the sight—what other than such a spot can be more grateful to the mind? Hence do the teachers of Brahma recommend such a holy and pleasing spot for worship. It behoves us to worship in a place in which the mind remains noble, pure and tranquil; because if the mind is anxious, disturbed and defiled, then the worship of the most Holy spirit cannot be suitably performed.

63. *Trirunnatangum etc.*

As the proper place for worship has been formerly indicated, so in this text we are told of the proper position in which we should seat ourselves. If we sit straight with our chest, throat and head held well up, then body and mind are not cramped; so we should sit thus during prayers, and concentrate all our sensations and perceptions on the mind.—Do not allow them to be occupied with various outward matters, but concentrate your heart and soul on the supreme spirit, and attain fulfilment by offering Him your heartfelt love.

প্রশস্তি।

(দরবেশ)

ঝন্‌—ঝন্‌—ঝন্‌
খুলিয়াছে ওই তোরণের দ্বার,
আয় সন্তানগণ!
আয় শত শত হাজার হাজার,
রেখে দে চিন্তা, রেখে দে বিচার,
অদূরে মায়ের মরকত-মোড়া
হৈম সিংহাসন।
বহুদিন,—ওরে বহুদিন ভাই,
কি যেন নেশার লোভে,
কাটিয়াছে তোর দীর্ঘ দিবস
ব্যর্থ আশার ক্ষোভে।
আজি খুলিয়াছে মুক্তির দ্বার,
ডেকেছে জননী সন্তানে তাঁর
লজ্জা সরম রাখিতে এবার
কর রে জীবন পণ।

* * * *

আর তুমি নহ দীন;
নিঃস্ব রিক্ত দৈন্যের ভরা,
তৃণ হতে অতি হীন।
ধর্ম্মের যত করিয়াছ ভান,
ভাইকে দেখেছ পশুর সমান,
নারীর করেছ শত অপমান,
আজি বিচারের দিন।
পথের সকল কণ্টক দলি'
অবিচল পদভরে;
মায়ের দুয়ারে দাঁড়া এসে সবে
নীরবে যুক্ত-করে।
নয়নে অশ্রু সমবেদনার,
বুকভরা লহ প্রেমের পাথার,
যুগে যুগে যত জমিয়াছে ভার,—
শুধে দাও সেই ঋণ।

ঝড়।

(১২ বৎসর বয়স্ক বালকের লিখিত)

ওরে ঝড়—আমি তোমায় বড় ভালবাসি—বহিয়া এসো—বহিয়া এসো—আমিও আজ অবধি গাহিব ঝড়ের গান। চলিয়াছে মেঘগুলি কেমন হু হু স্বরে—ছুটিয়াছে প্রাণের ভিতর কত প্রবল আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া! আমারও ইচ্ছা হয়—ঐ মেঘগুলির সঙ্গে আমিও হু-হু করিয়া ত্বরিতবেগে উড়িয়া চলি—আর উহাদেরই মত যেখানে যত কিছু মলিনতা দেখিব সমস্তই উড়াইয়া লইয়া চলিব। ওরে ঝড়—তুমি ঝড়ের মত বহিয়া আসিয়া প্রাণের ভিতর ঝড় লাগাইয়া দাও—আর আমার নির্জীব প্রাণেও সজীবতা আনয়ন কর। তোমার অগ্রগামী দূত—ঐ গুরু-গুরু শব্দ আমার প্রাণের ভিতর কেমন এক কর্ম্মের উন্মাদনা আনিয়া দিতেছে—মনে হইতেছে—এ কাজ সে কাজ—কত কাজই করি—হৃদয় যেন মুহূর্ত্তের বিশ্রাম লইতে চাহে না।

নীরবে বসিয়া ধ্যান করিবার অবসর নাই—মেঘগুলি হু-হু করিয়া চলিয়া আসিতেছে—এ কি রে ঝড়ের খেলা—দেখিতে দেখিতে অন্ধকার হইয়া আসিল—কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে প্রাণটা বুঝি এই রকমই অন্ধকার হইয়া আসে। মেঘের দিকে চাহিয়া দেখি—তাহাদের মধ্যে কর্ম্মের কতই খেলা চলিতেছে—এ মেঘ ও-দিকে যাইতেছে, ও মেঘ এ-দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে হু-হু স্বরে ধূলা উড়িল—ধূলায়-ধূলায় আকাশ পাটল হইয়া উঠিল। সমস্ত লোক কর্ম্মের প্রাণে সচকিত হইয়া উঠিল—তাহাদের নির্জীবতা সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল—জনসংজ্যের ভিতর হইতে একটা আতঙ্কের কোলাহল ধ্বনিত হইয়া উঠিল—কর্ম্মের প্রাণ সাড়া দিয়া উঠিল। বাতাস বহিল প্রচণ্ডবেগে—বহুক; কড়-কড়-কড় পড়িল বাজ—পড়ুক। শুনিবে এসো—কে শুনিতে চাও—এই সমস্তের ভিতর হইতে একটা মহান মহান উদার প্রাণের কি গভীর প্রেমের আহ্বান আসিতেছে! এই প্রেমের আহ্বানেই আজ গগন-ভুবন এক হইয়া গেল—গগন হইতে প্রেমের ধারা নামিয়া ধরণীকে সিক্ত করিয়া তুলিল—ধরণী নিজের প্রাণের শুষ্কতা ভুলিয়া গিয়া আবার শস্য উৎপাদন প্রভৃতি কর্ম্মে লাগিয়া যাইবে।

আমারও প্রাণ চায়—যেখানে যাহার প্রাণ দুঃখে কষ্টে শুষ্ক অঙ্গার হইয়া উঠিয়াছে, আমার এই প্রাণে তাহাকে তুলিয়া লই এবং আমার প্রেমের ধারায় তাহার প্রাণকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলি—সে আবার উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া পড়ুক। কর্ম্মেতে প্রেমেতে কি অপূর্ব্ব মিলন। আমার প্রাণ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, অন্ধকার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া, জগতে আলোকের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। এস—ঝড়—এস—কর্ম্মের আর প্রেমের অপূর্ব্ব মিলনের ভিতর দিয়া তোমারই সঙ্গে অনন্তের উপকূলে যাইতে চাই। যেখানে মিথ্যা দেখিব, ছলনা দেখিব—আমি তোমারই মত প্রেমের প্রবল ঝড়ে সে সমস্ত উড়াইয়া দিয়া সত্য আনিব—ধর্ম্ম আনিব; আমি অশ্রু ফেলিব—ফেলিয়া দীনদুঃখীর অশ্রু মুছাইব। পদে পদে বাধা পাই বটে—ঝড়ের বেগে সুখশান্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কায় কেহ সহজে নিজের আঁধার ঘরেরও দুয়ার খুলিতে চাহে না—সত্যকে—ধর্ম্মকে সহজে প্রবেশ করিতে দিতে চাহে না—তাহা হউক—আমার কর্ত্তব্য করিতে কিছুতেই পিছাইতে পারিব না। ওরে ঝড়—আমাকে শিখাও—কেমন করিয়া এই সমস্ত কৃপাপাত্র দীনদুঃখীর পাষাণবুকের বাধাগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিতে পারি।

ঝড়ের গান।

মিশ্র মল্লার—আদ্ধা।

একি পিঙ্গল জটা রুদ্রমূর্ত্তি !
তাণ্ডব নর্ত্তনে প্রলয় প্রকৃতি !
হুঙ্কার ছাড়ি' অসুর সুপ্ত
সহসা জাগিয়া করিতে লুপ্ত
চাহিছে সকল বিশ্বের স্থিতি—
তাণ্ডব নর্ত্তনে প্রলয় প্রকৃতি !

কথা ও সুর—শ্রীরমলা বসু। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১´ • ১´ •
II মা গা রা -া। রা রা রা রা I -া রা গা মা। গা -া রসমা -া I
এ কি পি • ঙ্গ ল জ টা • রু • দ্র মূ • র্ত্তি• • •

১´ • ১´ •
I রা -মা মা মা। পা -া পা পা I মা পা ধা পা। মা -গা রসমা -া II
তা • ণ্ড ব ন • র্ত্ত নে প্র ল য় প্র কৃ • তি• • •

১´ • ১´ •
II মা -পা না না। না না -া -া I -া র্সা র্সা র্রা। র্সা -না র্সা -া I
হু • ঙ্কা র ছা ড়ি • • • অ সু র সু • প্ত •

১´ • ১´ •
I -া না র্সা র্রা। র্মা র্রা র্সা -া I -া র্সা র্রা র্সা। ণা -পা পা -া I
• স হ সা জা গি য়া • • ক রি তে লু • প্ত •

১´ • ১´ •
I -া মা পা পা। মা মা রা -া I মা পা না না। র্সা র্সা -া -া I
• চা হি ছে স ক ল • বি • শ্বে র স্থি তি • •

১´ • ১´ •
I না র্সা র্রা র্মা। র্রা -া র্সা র্সা I ণা ণা পা ণা। পা -মা গা -রা II II
তা • ণ্ড ব ন • র্ত্ত নে প্র ল য় প্র কৃ • তি •

আনন্দ।

আশাবরী—তেতালা।

তব চরণকমলে মম মনভ্রমর
আজি প্রাতে ধায় হর্ষে বিভোর।
দিব তোমারে—কিছু নাহি গো;
নিয়েছ সব হরি' মোর॥
হাসে চারি দিশি ফুল পাতা;
গগনে উথলে আনন্দ-ঝোর।
ভিক্ষা পদে তব—রাথ বাঁধিয়া দের।
দিয়া প্রেমের ডোর॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সুর—মহারাজা নবলকিশোর।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
সঙ্গীততত্ত্বার্ণব শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

[পা পা]

০ ১ ২´
{ মা মা II মা পা পা পদণর্সা। ণা দা পা পা। মা মা পা ণদা।
ত ব চ র ণ ক••• ম লে ম ম ম ন ভ্র ম

৩ ০ ১ ২´
। পা পমপা জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা -া ঋা -া। সা ণ্া সা -া। মা -া পা দর্সা।
র আ• • জি প্রা • তে • ধা • • য় হ • র্ষে বি

৩ ০
। (ণা দা) } II ণা -া -দা পা।
ভো র্ ভো • • র্

০ ১ ২´ ৩
II {মা মা ণদা ণদা। ণা ণা র্সা -া। র্সা র্সণা র্সা জ্ঞর্ঋা। -া -া র্সা -া}।
দি ব তো• •• মা রে কি • ছু না • হি • • গো •

০ ১ ২´ ৩
। মা মা মা পা। -া পা সা সর্সণা। র্সা -া র্ঋা ণা। দা -া II দা পা II
নি য়ে ছ স • ব হ রি•• মো • • • • র্ "ত ব"

০ ১ ২´ ৩
II মা -া মা -া। পা পা পা পা। মা মা ণদা দা। দঃ র্সঃা র্সা র্সা।
হা • সে • চা রি দি শি ফু ল পা তা গ • গ নে

০ ১ ২´ ৩
। মা মা -া মা। পা দা র্ঋা র্সা। র্ঋণা র্সা -া ণদা। ণা -া দা পা।
উ থ • লে আ ন • ন্দ ঝো• • • •• • • • র্

০ ১ ২´ ৩
। {মা -া পা ণদা। ণদা ণা র্সা ণা। র্সা -া র্ঋা ণা। র্সা র্সা র্সা -া}।
ভি • ক্ষা প • দে ত ব রা • থ বাঁ ধি য়া দে র্

০ ১ ২´ ৩
। মা -া মা -া। পা -া সা র্সণা। র্সা -া -া র্সর্ঋা। ণা দা দা পা II
দি • য়া • প্রে • মে র• ডো • • •• • র্ "ত ব"

২´ ৩ ০
(তান) II মপা দণা র্সর্ঋা র্সণা। দপা মপা দণা র্সা। মা পা পা র্সা II
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ "চ র ণ ক"

২´ ৩ ০
(২) II সঋা মপা দর্ঋা র্সণা। দপা মপা জ্ঞঋা সসা। ঋা মা পা র্সা II
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ "চ র ণ ক"

২´ ৩ ০
(৩) II র্জ্ঞর্ঋা র্সর্ঋা র্সণা র্সণা। দণা মপা ণদা র্সা। মা পা পা র্সা II
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ "চ র ণ ক"

২´ ৩
(৪) II মপদা দপদা ণণদা ণর্সর্সা। ণর্সর্ঋা র্জ্ঞর্ঋর্সা ণদপা মা।
ম০০ ০ন০ ০০ভ্র ০০০ ম০০ ০০০ র০০ ০

০ ১ ২´
। মমপা পণদা ণণর্সাঃ র্সঃ। সা র্জ্ঞা -া -া। র্মা র্ঋা র্সা -া।
আ০০ ০০০ ০০০ জি প্রা ০ ০ ০ ০ ০ তে ০

৩ ০
। র্সর্ঋর্ঋা ণর্সর্সা দণণা পদদা। মা পা পা র্সা II
ধা০০ ০০০ ০০০ ০০য় "চ র ণ ক"

২´ ৩ ০
II মা পা ণদা ণা। র্সা ণদা -া পা। পদা মপা মজ্ঞা -া I
ম ০ ০ ০ ০ ন ০ ০ ভ্র০ ০০ ম ০

১ ২´ ৩
I -া ঋা সা -া। ণ্া -া সা সা। ণ্সা ঋমা পদা মপা।
০ ০ র ০ আ ০ ০ জি প্রা০ ০০ ০০ তে০

০ ১ ২´
। দণা র্সর্ঋা র্জ্ঞর্ঋা র্সণা I দপা মপা দণা র্সর্ঋা। র্ঋণা র্সর্সা দণা ণপা।
০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ধা ০০ ০০ ০০

৩
। দদা মপা দণা র্সা II
০০ ০০ ০০ য়

০ ১ ২´ ৩
II{ মা পা ণদা -া। ণা ণা র্সা -া। র্সা ণা র্সা র্ঋর্ঋা। -া -া র্সা -া I
দি ন তো ০ মা রে কি ০ ছু না ০ হি ০ ০ গো ০

০ ১ ২´ ৩
I (মপা ণর্সা র্ঋর্জ্ঞা -া। -া -া র্ঋা -া। -া র্জ্ঞা র্সা -া। -া -া ণদা পমা) } I
০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০

০ ১ ২´ ৩
I মা মা মা পা। -া পা সা র্সণা। র্সা -া -া মা। পা ণদা ণা র্সা I
নি য়ে ছ ন ০ ব হ রি০ মো ০ ০ ০ ০ ০ ০ বৃ

০
I মা পা পা র্সা II
"চ র ণ ক"

শান্তি।

আড়ানা—চৌতাল।

প্রাণের মাঝারে ঝরিছে আজ
নয়ন-আসার হে—শান্ত করি দাও।
মম হৃদি-সিংহাসনে এসো এসো দেব!
কৃপা করি' শান্তিবচন হে শুনাও।
তব বদনজ্যোতি প্রাণে হেরিয়া
দুখ-সাগর পাশরিব,—তব পদে প্রভু রাখ আমায়।
তুমি ত্রিভুবনরঞ্জন—তুমি কঠিন দুখভঞ্জন।
মহেশ তুমি সবার সুখদায়ী॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুর—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
II II মা রা। মা পা I র্সা -া। ণপা পা। -া -া। মা -া।
প্রা ০ ণে র মা ০ ০০ ঝা ০ ০ রে ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। পা পদঃ মপঃ। মজ্ঞা -া I মা রা। -া -া। -া জ্ঞসা। সা ণ্া।
০ ঝ০ রি ছে ০ আ ০ ০ ০ ০ ০জ ন য়

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। প্া -া। সন্া সা I সা রা। মরা মা। পা -া। -া ণমা।
০ ০ ন০ ০ আ সা র০ হে ০ ০ ০শান্

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। পা র্সা। নর্সা র্সা I র্সনা র্রা। র্সা র্রনা। র্সা ণপা। ণা পা I[
০ ত ০০ ক রি০ ০ ০ দা০ ০ ০০ ০ ও

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II II { মা পা। ণপা র্সা। র্সা র্সা। র্সাঃ র্সঃ। র্রা না। র্সা র্সা I
ম ম ০০ হৃ ০ দি সিং ০ হা ০ স নে

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা -া। র্সনা র্সা। র্রা র্সা। র্রনা র্সা। -া ণপা। ণা পা } I
এ ০ সো০ ০ এ সো দে০ ০ ০ ০০ ০ ব

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I মা পা। -া র্সা। র্সা র্রা। র্রা র্মজ্ঞা। -া র্রর্সা। র্রা র্সা I
কৃ ০ পা ক ০ রি শান্ তি০ ০ ব০ চ ন

১´ ০ ২ ০
I র্সা র্সনা। র্রর্সা র্রনা। র্সা ণপা। ণা পা II II
হে শু০ ০ না ০ ০০ ০ ও



আকারমাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

১। স র গ ম প ধ ন=সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন—স্বরের নীচে হসন্ত, এবং উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন—স্বরের মাথায় রেফ্।

২। কোমল র=ঋ; কোমল গ=জ্ঞ; কড়ি ম=হ্ম; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ণ।

৩। তাল বিভাগের চিহ্ন, পার্শ্বে এক-একটী দাঁড়ি। ১, ২´, ৩, ০ ইত্যাদি তালি ও ফাঁকের অঙ্ক। যে অঙ্কের মাথায় রেফ্ তাহাই সম্।

৪। তালের একফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে "আই" এই ইংরাজী অক্ষরটী বসে; আরম্ভ ও শেষে দুই "আই" বসে।

৫। একমাত্রা=া। অর্দ্ধমাত্রা=ঃ। দুইটী অর্দ্ধমাত্রা, যথা 'সরা'। চারিটী সিকিমাত্রা, যথা "সরগমা"। দুইটী সিকিমাত্রা, যথা সরঃ। একটী অর্দ্ধমাত্রা ও দুইটী সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা, যথা সঃ গরঃ। একটী দেড়মাত্রা ও একটী অর্দ্ধমাত্রা মিলিয়া দুই মাত্রা, যথা রাঃ গঃ।

৬। কোন আসল সুরের পূর্ব্বে যদি কোন নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক সুর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই সুরটী ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল সুরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, সরা—গরা। গমকের স্থলে প্রায়ই এইরূপ স্পর্শমাত্রিক সুর লাগিয়া থাকে। আসল সুরের পরে কখন কখন অন্য সুরের ঈষৎ রেশ লাগে; তখন ঐ সুর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত হয়, যথা রাস।

৭। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন্-বর্জ্জিত হইলে, এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা বিরামের মাত্রা বলিয়া জানিবে। সুরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

৮। অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি। হয় এইখানে একেবারে থামিবে; নয় এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

৯। পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া "আই" বসে। কোন কলির শেষে II এই যুগল "আই" দেখিলেই আস্থায়ীর যেখানে এইরূপ যুগল "আই" আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

১০। পৌনরুক্তির চিহ্ন, এই { } গুম্ফ বন্ধনী; এবং পৌনরুক্তিকালে কতকগুলি সুর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন, এই ( ) বক্র বন্ধনী, যথা { সা রা গা (মা পা) ধা না }

১১। পুনরাবৃত্তি ও পৌনরুক্তিকালে কোন সুরের পরিবর্ত্তন হইলে, শিরোদেশে ব্র্যাকেটের মধ্যে পরিবর্ত্তিত সুরগুলি স্থাপিত হয়। যথা,—

[রা গা মা]
সা রা গা।

সঙ্গীতচর্চ্চা।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)

সঙ্গীত চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার একটী প্রধানতম কলা। ইহাকে সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে চাহিলে শিক্ষা ও সাধনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই ; তবে সঙ্গীতের মূল ভাবটী মানুষের প্রকৃতি-নিহিত বলিয়াই মনে হয়। শিশুর যখন কোন বোধই জাগ্রত হয় নাই, তখনও তাহার সুরবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মায়ের কণ্ঠের 'ঘুম পাড়ানিয়া' গান শুনিয়া শিশুর কান্না থামে, মুখে হাসি ও চক্ষে দীপ্তি জাগিয়া উঠে। কোথাও এমন একটী অসভ্যজাতিরও নিদর্শন পাওয়া যায় না, যাহাদের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চ্চা—তা সে যত অবিশুদ্ধ আকারেই হউক না—কিছু-না-কিছু বিদ্যমান না আছে। যদি সহজ কথায় সঙ্গীতের একটা 'লক্ষণ' বলিতে হয়, তবে বোধ হয়, উহাকে 'ভাবের ভাষা' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। মানুষের মনে প্রতিনিয়তই নানা ভাবের উদয়াস্তের খেলা চলিতেছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যখন তাহার মনের আকাশে গাঢ়তা লাভ করে তখনই তাহারা প্রকাশলাভের আনন্দে সুরের ধারায় ঝরিয়া পড়িতে চায়। তাই, এমন কি, মানুষের হাসি-কান্নার মাঝেও সুরের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুরই তান-লয়ে যুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইলে সঙ্গীতের আকারে অভিব্যক্ত হয়। সঙ্গীতের মত বিদ্যা আর নাই। "ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা" শাস্ত্রের এই উক্তি অতি সুসঙ্গত। বনের পশু হইতে স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যায়।

ভারতবর্ষই সঙ্গীতের আদি জন্মভূমি। সপ্তস্বর সর্ব্বপ্রথম এখানেই উদ্ভাবিত হইয়া পরে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালেই ভারতীয় সঙ্গীত চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ রাগ-রাগিণীর স্বরবিন্যাসে ও মূর্ত্তিকল্পনায় যে একটী কলানৈপুণ্য ও গুণপণা দেখা যায়, তাহা আধুনিক সভ্যজাতির সমুন্নত সঙ্গীত-বিজ্ঞানেও একান্ত দুর্লভ। ইহা ব্যতীত ভারত তাহার চিরন্তন স্বভাব অনুসারে সঙ্গীতকে কোনও দিন কেবল মাত্র ঐহিক তৃপ্তির নিদান বলিয়া মনে করে নাই—সে ইহাকে পারমার্থিক শ্রেয়লাভেরও সাধন করিয়া তুলিয়াছিল। এই জন্যই ভক্ত ভগবানের নিকট শুনিতে ভালবাসে—

> নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
> মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

"হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগীদিগের হৃদয়ে বাস করি না—আমার ভক্তেরা যেখানে গান করে আমি সে খানেই থাকি।"

আবার,—

> "জপ-কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো লয়ঃ।
> লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

ইত্যাদি উক্তি এই জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু হায়! এই সঙ্গীতের একদিন আমাদের দেশে বড় অধঃপতন ঘটিয়াছিল। আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি, কোন ভদ্রপরিবারে নিয়মিত সঙ্গীতচর্চ্চার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। পরিবারের মধ্যে যদি দৈবাৎ দুই-একটী বালকের সঙ্গীতে অনুরাগ প্রকাশ পাইত, তবে গুরুজন ও পাড়াপ্রতিবাসীর নিকট তাহাকে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইতে হইত। এইরূপে সঙ্গীতচর্চ্চা তখন একটী নৈতিক অপরাধরূপেই সমাজে গণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে দেশের সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন সকলেই ইহাকে একটী ললিতকলারূপে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং ইহার নিয়মিত অনুশীলনকে শিক্ষারই একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। বিশেষতঃ এই কলিকাতা নগরে বর্ত্তমানে সঙ্গীতচর্চ্চা খুবই প্রসারলাভ করিয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ইহার সূত্রপাত করিলেও 'সঙ্গীতসঙ্ঘ' ও 'সঙ্গীত-সম্মিলনী' প্রমুখ বিভিন্ন সঙ্গীতবিদ্যালয়গুলি এবং পূজ্যপাদ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত 'আকার-মাত্রিক স্বরলিপি' এবিষয়ে যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। এই আকার-মাত্রিক স্বরলিপিপদ্ধতিতে সঙ্গীত প্রকাশ করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা', প্রতিভা দেবীর 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা' প্রভৃতি অনেকগুলি সঙ্গীতবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সকল পত্রিকা আজ

বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অথচ মাসিক পত্রিকার এই ক্রমোন্নতির যুগে ধর্ম্ম ও সাহিত্য, স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়িণী নব নব পত্রিকার অভ্যুদয় ঘটিলেও সঙ্গীতবিষয়ক পত্রিকার অভাব-মোচনে কাহাকেও বিশেষ যত্নবান দেখি না। এইজন্য গত চৈত্রসংখ্যায় আমরা পাঠকদিগকে জানাইয়াছিলাম যে, আগামী বর্ষের প্রথম বৈশাখসংখ্যা হইতে ন্যূনাধিক এক ফর্ম্মা করিয়া বিশেষভাবে সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ ও স্বরলিপিসহ সুভাব সঙ্গীত সকল প্রকাশ করিব। এ বিষয়ে সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত-তত্ত্বার্ণব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়প্রমুখ অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি এবং সঙ্গীতানুরাগী অনেক যুবক ও মহিলা আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ইহা ব্যতীত আর একটী বিষয়েও আমাদের দৃষ্টি আছে। আজকাল শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শাস্ত্রগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রচার দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যকে সম্পৎশালী করিবার জন্য অনেকের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। এ বিষয়ে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ'ও বিশেষ যত্ন লইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি ছোটখাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুবাদ কার্য্যে এ পর্য্যন্ত কেহই অগ্রসর হয়েন নাই। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পূজ্যপাদ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার "সঙ্গীত-প্রকাশিকায়" এই কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহার সেই অসমাপ্ত কার্য্যভার গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গালার বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এবার এই নূতন বর্ষে আমরা যে নব কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছি তাহা নিতান্ত সহজ নহে; তবে আমরা আশা করি, পাঠক ও অনুগ্রাহকগণের নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনুকূল্য পাইলে আমাদের এই আয়োজনকে আমরা সুসম্পূর্ণ করিতে পারিব। এই সূত্রে রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ, অতুল-সেন, ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেরই সুভাব সঙ্গীত প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল।

অসমীয়া বৈষ্ণব বনমালী দেব ও বংশীগোপাল দেব।

(আসামপর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরভাগে রম্ভাবাড়ী নামে একটী গ্রাম ছিল। সেখানে দশরথ নামে পরাশর-গোত্রীয় জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র "যদুদেব" মহেন্দ্র ভারতী নামক জনৈক ভাগবত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কন্যা "মাধবপ্রিয়া"র পাণিগ্রহণ করেন। এই মাধবপ্রিয়ার গর্ভে ১৪৯৮ শকের ভাদ্রমাসে "বনমালী দেব"এর জন্ম হয়।

বনমালী দেব অতি অল্প বয়সে সর্ব্বপ্রথম বংশীগোপাল দেবের নিকট ভাগবত-শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। বংশীগোপাল দেবের তিরোভাবের পর তিনি পাটবাউসীতে ভট্টদেবের নিকট গিয়া ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতেন। এখানে কিছুকাল অবস্থানের পর জগন্নাথক্ষেত্র দর্শনে তাঁহার বাসনা হয়। তিনি ভট্টদেবের নিকট বিদায় লইয়া কোচবিহারে গমন করিলেন।

কোচবিহারে প্রগাঢ় ভাগবত-শাস্ত্রজ্ঞ বলদেব তাঁহাকে সাদরে স্থান দিলেন। বনমালীদেব তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বনমালী-দেবের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া কোচরাজ প্রাণনারায়ণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কোচবিহারে বনমালী দেবের প্রায় দেড় বৎসর কাল অবস্থানের পর তদীয় গুরুদেব স্বর্গগত হন।

বলদেব অন্তিমকালে বনমালী দেবের উপর সকল সত্রের ভার ন্যস্ত করিলে পরমানন্দ দেব (১) এর ভ্রাতুষ্পুত্র মনক্ষুণ্ন হইয়া বিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন। বনমালী দেব তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরমানন্দ দেব তাঁহার সঙ্গে যাইতে একান্ত ইচ্ছুক

(১) দামোদর দেব অন্তিমকালে বলদেব ও পরমানন্দ দেবের উপর বেহার-সত্রের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

হইলেন। উক্ত কোচরাজ এই গমনসংবাদে ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে এই সংকল্প পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া একখানি নূতন সত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এখানে কিছুকাল অবস্থানের পর পরমানন্দ দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বনমালী দেবের উপর তদীয় ধর্ম্মগদি ও শিষ্যদিগের ভার অর্পণ করেন।

পরমানন্দ দেবের দেহত্যাগের কিছুকাল পরে আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ বনমালী দেবকে দূত দ্বারা নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনয়ন করত "কালিয়াবর" নামক স্থানে তাঁহার জন্য একটী সত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। অতঃপর তিনি রাজ-আনুকূল্যে দক্ষিণপাট সত্র নির্ম্মাণ করেন। বনমালী দেব কতিপয় ভক্ত দ্বারা জগন্নাথ ক্ষেত্র হইতে "যাদবরায়" নামক বিগ্রহ আনাইবার পর শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। ১৬০৫ শকে আশ্বিন মাসে শুক্লা সপ্তমীতে ১০৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার তিরোভাব হয়। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামদেব উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

শঙ্করদেবের চরিত-লেখক দ্বিজ রামানন্দ ব্যতীত বনমালী দেবের জনৈক শিষ্যের নাম ছিল রামানন্দ; কারণ ইনি বনমালী দেবের চরিত-পুঁথিতে আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন—

সিটো বনমালী দেব তোমার কিঙ্কর।
তাহান কৃপাত ভাগ্য মঞি দুখিতর॥

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বনমালী দেব দক্ষিণপাট সত্র স্থাপন করেন। এই দক্ষিণপাট সত্র পরবর্ত্তীকালে শাক্তমতের সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহার ঐতিহাসিক কারণ আছে। আহোমরাজগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শাক্তমত অবলম্বন করিলে রাজ-অনুগ্রহপ্রাপ্তির আশায় দক্ষিণপাট সত্র শাক্ত আদি মন্ত্র দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু মূলত উহাতে মহাপুরুষীয় ভাব ছিল। আমরা বনমালী দেবের চরিত-পুঁথি দেখিয়াছি। উহাতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন দেবতার পূজা বা অর্চ্চনা করিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু ঐ চরিত-পুঁথিতে একটী মনোরম ঘটনা আছে যে, একদিন তিনি দৈবক্রমে এক শিবলিঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হঠাৎ একটু বিব্রত হইয়া তিনি তাঁহাকে নিম্নলিখিতরূপ প্রণাম করিলেন:—

"হরিবুদ্ধি করি তাঙ্ক করিলন্ত সেব।
নমো নমো লক্ষ্মীপতি ভগবন্ত দেব।

* * *

অনেক করিলা স্তুতি বিষ্ণু হেন মানি।
প্রেমে মগ্ন হুয়া কিছো নোবোলন্ত বাণী॥"

অর্থাৎ শিবমূর্ত্তিকে তিনি "লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু" বলিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে অন্য দেবতা বলিয়া স্বীকার করিলেন না; কারণ তাহা হইলে "এক কারণ" থাকে না।

দক্ষিণপাট সত্রের বর্ত্তমান গোস্বামীর নাম শ্রীযুত নরদেব গোস্বামী।

বংশীগোপালদেব।

দেবগোপাল ১৪৭০ শকে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিবার উজনী অঞ্চলের মালিপুর গ্রামে শৌণ্ডিল্যগোত্রীয় ধর্ম্মাই আচার্য্য নামান্তরে বলদেবের ঔরসে এবং যমুনা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই বংশীগোপালদেব নামে অসমীয়া বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। ইঁহার পিতামহ হরিবর আচার্য্য (২) একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সদিয়া অঞ্চলের ব্যাঘ্রপিণ্ডা গ্রামে বসবাস করিতেন। তৎপুত্র বলদেব কোন কারণে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া মালিপুরে আসিয়া বসবাস করেন। এই মালিপুর কোথায় এবং অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই।

বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ ঘটিলে দেবগোপাল জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণপুরে তদীয় ভগ্নীপতি লক্ষ্মীকান্তদেবের (৩) গৃহে প্রতিপালিত হন। এখানেই তাঁহার উপবীত ও বিদ্যাশিক্ষা হয়। এই নারায়ণপুর অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষ মাধবদেব (৪) ও হরিদেবের জন্মস্থান।

(২) হরিবর আচার্য্য—ইঁহার তিন পুত্র, যথা:- ধর্ম্মাই, কর্ম্মাই ও পরমাই।

(৩) লক্ষ্মীকান্তদেব—ইঁহার পুত্র শ্রীহরিদেব, মাধবদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন।

(৪) মাধবদেব—ইঁহার জন্মস্থান একণে নিবিড় অরণ্যাবৃত। বর্ত্তমানে উহার নাম "রঙ্গতি পথার।"

উড়িষ্যার কথা।

(শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়, বি-এল্)

১। উড়িষ্যার প্রাকৃতিক দৃশ্য।

উড়িষ্যার উত্তরপূর্ব্ব সীমা হইতে কলিকাতা প্রায় এক শত মাইল দূরে অবস্থিত। বহুদিন হইতে উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রায় ত্রিশ হাজার বাঙ্গালী উড়িষ্যায় চিরস্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন। উড়িষ্যারও বহুলোক ব্যবসা ও অন্যান্য কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ পল্লীগ্রামসমূহে অবস্থিতি করিতেছেন। উড়িষ্যার তীর্থসমূহে প্রতিবৎসর শত শত বাঙ্গালী যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সমাজ-সাহিত্য, আচার-ব্যবহার এবং উপাসনাপ্রণালীতে এই দুই দেশের মধ্যে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীর সাগরতীরে অষ্টাদশবর্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রেমের সাধনায় কাটাইয়াছিলেন। ঐ পুরীতেই তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধিকাংশ লোকের নিকট সমাদৃত হইতেছে। ধর্ম্মের আকর্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালী ও উৎকলীয় এক বৃন্তের দুইটী ফুলস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক বাঙ্গালীরই উড়িষ্যার বিষয় কিছু জানা আবশ্যক। অতি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা উড়িষ্যা দেশে যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ প্রায় অন্যত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। সাহিত্যে, সামাজিক রীতিনীতিতে ও শিল্পকলায় সেই সভ্যতার চিহ্ন আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। উড়িষ্যার সভ্যতা বিদেশীয় সভ্যতার ভারে কোন দিন আক্রান্ত হয় নাই। কেবলমাত্র ১২০ বৎসর পূর্ব্বে এই দেশ হিন্দুরাজার অধীনে ছিল। মোগল, পাঠান ও মারাঠা শাসনে উড়িষ্যার বিশেষত্ব কোন দিন লোপ পায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিজেতার দল সৈন্যসামন্ত লইয়া উড়িষ্যা দেশের উপর দিয়া প্রবল বাত্যার ন্যায় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দেশ জঙ্গলময় ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশে পুরাকাল হইতে মহাবন নামে যে বিস্তীর্ণ অরণ্যানী রহিয়াছে, তাহার পূর্ব্ব প্রান্ত উড়িষ্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

উড়িষ্যা দেশে যাতায়াতের প্রধান অন্তরায় অনেকগুলি নদী। বর্ষার সময় নদীগুলি অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং জলপ্লাবনে দেশ ভাসিয়া যায়, কিন্তু অন্য সময়ে নদীগর্ভে জল থাকে না, এবং নৌকাযোগে যাতায়াত অসম্ভব হইয়া উঠে। বি, এন্, রেল-লাইনের খড়গপুর ষ্টেশনের নিকট ঢিপীর মত যে পর্ব্বত দেখা যায় তাহাই পূর্ব্বঘাটের উত্তর সীমা; সেই প্রস্তরময় ভূমি ক্রমশঃ উচ্চতায় বর্দ্ধিত হইয়া উড়িষ্যা ভেদ করিয়া গঞ্জামের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। উড়িষ্যার মধ্যদেশে কোন একটী অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালা দেখা যায় না বটে, কিন্তু উড়িষ্যার প্রত্যেক মিত্ররাজ্যেই অনেক পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। বন, গর্ব্বত, নদী ও উপত্যকা উড়িষ্যা দেশকে প্রকৃতির লীলাকানন করিয়া রাখিয়াছে। রেল ও জাহাজ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এই সকল প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যই দেশটীকে নিতান্ত দুর্গম করিয়া রাখিয়াছিল। উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে চিল্কাহ্রদ; হ্রদটী এত মনোরম যে উৎকলের কবিকুল-চূড়ামণি পরলোকগত রাধানাথ রায়* মহাশয়, তাঁহার 'চিলিকা' নামক বিখ্যাত কবিতায় তাহাকে "উৎকল-কমলা-বিলাস-দীর্ঘিকা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হ্রদটী প্রায় ২০ মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল প্রস্থ। হ্রদ মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট খণ্ড-শৈল বিদ্যমান। প্রত্যেক শৈলগাত্র পত্রপুষ্পে এরূপ সুশোভিত যে দূর হইতে দেখিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন বলিয়া বোধ হয়; হ্রদের পশ্চিমদিকে বাণপুর ও গঞ্জামের উচ্চ শৈলমালা চিল্কাহ্রদের ভিতর হইতে মেঘমালার মত প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বদিকে মহাসমুদ্র 'মাণিক পাটনার' সঙ্কীর্ণ প্রণালী দিয়া হ্রদটীর অঙ্গপুষ্টি করিতেছে। বস্তুতঃ উড়িষ্যার মত প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত দেশ প্রায় দেখা যায় না; এই হিসাবে বোধ হয় তাহার সহিত আসামের তুলনা করা যাইতে পারে।

২। গড়জাত মহল ও অনার্য্যজাতি।

উড়িষ্যা দেশে পাঁচটী জেলা আছে; যথা—বালেশ্বর, কটক, পুরী, সম্বলপুর ও অনুগোল। এই কয়েকটী জেলাই ইংরাজ-শাসন-ভুক্ত। বালেশ্বর কটক ও পুরী সমুদ্রকূল হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। এই

* আগামী জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় আমরা ইঁহার একখানি ফটো-চিত্র প্রকাশ করিব। তঃ সং

তিনটী জেলার পশ্চিমে কতকগুলি দেশীয় রাজ্য অবস্থিত। পূর্ব্বেই ইহারা করদ-রাজ্য বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের শাসন সময় হইতে ইহা-দিগকে ফিউডেটরি বা মিত্ররাজ্য বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ময়ুরভঞ্জ, ঢেঙ্কানল ও কেঁউঝর প্রভৃতি চব্বিশটী মিত্ররাজ্য বা 'গড়জাত মাহাল' আছে। প্রত্যেক গড়জাত মাহালে এক-একটী রাজা আছেন। তিনি নিজ রাজ্য মধ্যে সমস্ত আইন-কানুন করিবার মালিক। কোন কোন রাজবংশ অতি প্রাচীন; এমন কি হাজার দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে ভারতে কত রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সকল গড়জাতের রাজা ও প্রজা সে সকল পরিবর্ত্তনে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত না হইয়া একই ভাবে, তাঁহাদের জীবন কাটাইয়া আসিতেছেন। ইহার কারণ এই যে প্রত্যেক গড়জাতই অরণ্য ও পর্ব্বতে সমাকীর্ণ, বাহিরের বিপ্লব সেখানে পৌঁছিতে পারে নাই। এক গড়-জাত হইতে অন্য গড়জাতে যাইবার সুবিধাজনক রাস্তা অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও ছিল না। প্রায় অধিকাংশ গড়জাতের রাজারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের বর্ণ, আকৃতি প্রকৃতি ও ব্যবহার দেখিলে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব বলিয়া মনে হয়। প্রায় সমস্ত গড়জাতের অধিকাংশ লোকই অনার্য্য বা অনার্য্য-কুলসম্ভূত। কোল, সাঁওতাল, কন্ধ, গণ্ড, জুয়াং, পাতুয়া, শওর, শবর, পাণ প্রভৃতি নানা অনার্য্য জাতি ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ হইতে এই সকল দেশে বাস করিয়া আসিতেছে। জুয়াং ও পাতুয়া জাতির স্ত্রীলোকেরা আজিও স্থানবিশেষে বৃক্ষপত্র সেলাই করিয়া পরিধান করিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, সভ্যতার কত বিভিন্ন স্তর নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া গড়জাত মাহালে আজিও বিদ্যমান আছে। অনার্য্যজাতিদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সামাজিক প্রথা ও উপাসনাপদ্ধতি প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র; কোথাও কোথাও অনার্য্যজাতিগণ আর্য্যদিগের সমাজনীতি, ব্রাহ্মণের আনুগত্য, উপাসনা ও পূজাপদ্ধতি অনুকরণ করিতেছে মাত্র; কিন্তু ভাবে ভাষায় ও জাতিগত পার্থক্যে তাহারা আজিও সম্পূর্ণ অনার্য্য রহিয়াছে। এই সকল অনার্য্যজাতি রাজাকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে এবং আব-শ্যক হইলে তাহারা রাজার জন্য প্রাণপাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ইংরাজশাসনের পূর্ব্বে গড়জাতের অনার্য্যেরা নামে মাত্র তাহাদের আর্য্য রাজাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া অবাধে স্বচ্ছন্দ-মনে অরণ্য ও পর্ব্বতে বাস করিত। কারণ রাজ-দণ্ডের ভয় তাহাদের কোনদিন ছিল না। রাজার অত্যাচারের মাত্রা বর্দ্ধিত হইলে তাহারা "মেলী" বা ধর্ম্মঘট করিয়া রাজকর্ম্মচারী ও পাইকগণের প্রতিরোধ করিত। দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ও পর্ব্বতে কে তাহাদের গতিরোধ করিবে? অতি স্বল্পায়াসেই তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজদণ্ডকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিত। এইরূপ অবস্থায় প্রজা ও রাজার মধ্যে প্রায় সহজেই একটা মিটমাট হইয়া যাইত। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। অনার্য্য জাতিগণ সভ্যতার আলোকে আসিয়া অনেকটা নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে একজন পলিটিকেল এজেণ্ট রাজা-দিগের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে নিয়ত সংযত করিতেছেন। এখন অনার্য্যগণের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির পশ্চাতে বৃটিশবাহিনী ও অসংখ্য কামান গোলা রহিয়াছে; রাজাদের অনুরোধে ও পলিটি-কেল এজেণ্টের অঙ্গুলি চালনায় অসংখ্য সুশিক্ষিত সেনা আসিয়া অনার্য্য জাতিদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া যাইতে পারে; সুতরাং গড়জাত মাহালে পূর্ব্বাপেক্ষা রাজশক্তি অনেকগুণে অদম্য ও অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সম্বলপুর ও অনুগোল শাসনবিভাগ হিসাবে ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলেও লোক-সংখ্যা হিসাবে তাহাদিগকে অনার্য্যবহুল গড়জাত মাহালের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

গ্রন্থ-পরিচয়।

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা ও অব্যর্থ ঔষধ নির্ব্বাচন—ডাক্তার এস, সি, মুখর্জ্জির

নিকট ৮৩।১ নম্বর বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা এবং প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। ১১১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ৬।০ টাকা মাত্র। পুস্তকের বাঁধাই, ছাপা, কাগজ উত্তম।

প্রবীণ বহুদর্শী ডাক্তার শ্রীঅরুণোদয় মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপরোক্ত পুস্তক একখণ্ড আমরা পাইয়াছি। শুনিয়াছি যে গ্রন্থকার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন, পরে হোমিওপ্যাথি অবলম্বন করেন, এবং তিনি বলেন যে এই চিকিৎসা দ্বারা তিনি আশ্চর্য্য রোগমুক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অ্যালোপ্যাথির বদলে তিনি যে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমাদের এই দরিদ্র দেশে বহুমূল্য অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার সমধিক প্রচলন অসম্ভব। ইহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট বলিয়াই চলিতেছে। তৎসত্ত্বেও অল্পবিদ্য পণ্ডিতমূর্খ ভুঁইফোড় অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের দ্বারা পল্লী-গ্রামে যে অনিষ্ট সাধিত হয়, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-দিগের দ্বারা সে প্রকার অনিষ্ট হয় না, আর হওয়া সম্ভবও নহে—ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই কারণে এবং সুলভতারও কারণে আমরা হোমিওপ্যাথির বহুল প্রচলন দেখিতে চাই এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে হইলে দেশের মহদুপকার সাধিত হইবে বলিয়া আমা-দের বিশ্বাস। যাঁহারা হোমিও চিকিৎসায় কেহ আরোগ্য লাভ করিলে বলেন যে, সেই রোগী বিনা চিকিৎসাতেও ভাল হইতে পারিত, তাঁহাদের যুক্তি আমরা ঠিক ধরিতে পারি না; কারণ ঠিক সেই কথা অ্যালো চিকিৎসায় আরোগ্যলব্ধ ব্যক্তির পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে।

হোমিও সম্বন্ধে ডাক্তারের লিখিত কিন্তু অব্যবসায়ী সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কম আছে বলিয়া সাধারণ পাঠক রোগীকে যথোপযুক্ত ঔষধ দিতে পারেন না এবং কাজেই হোমিও চিকিৎসায় অশ্রদ্ধাবান হইয়া পড়েন। সমালোচ্য গ্রন্থের দ্বারা সাধারণ পাঠকের সেই অভাব দূর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—তাঁহারাও অনেকটা সহজে ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। সাধারণত হোমিও মেটিরিয়া মেডিকাতে দেখা যায়, একই রোগের জন্য অনেকগুলি ঔষধ উল্লি-খিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সকলের ভিতর ঠিক কোন্‌টী রোগের কোন্ অবস্থায় ব্যবহার্য্য,সেই অবস্থাগুলি কোথাও স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই। গ্রন্থকার বহু আয়াসে সুপ্রসিদ্ধ অনেক ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্যে সেই সকল অবস্থার সুক্ষ্ম-সুক্ষ্ম লক্ষণগুলি যথাযথ বর্ণনা করিয়া প্রত্যেক অব-স্থার পক্ষে ঔষধ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রোগীর ধাতু, শারীরিক গঠন, হ্রাসবৃদ্ধির সময় ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সবিস্তার সন্নিবেশের ফলে গ্রন্থ-খানি চিকিৎসক, ছাত্র ও সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার বিশদ ও সরল ভাষায় মহাত্মা হ্যানিম্যানের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং হোমিও চিকিৎসার প্রসার ও প্রতিপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া গ্রন্থখানিকে অভিনব সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছেন। এরূপ সুচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সমালোচ্য গ্রন্থে রোগের উল্লেখ বিষয়ক দুইটী সুবি-স্তৃত সূচী থাকায় গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে এবং তাহা দ্বারা সাধারণ পাঠকের পক্ষে ঔষধ নির্ব্বাচনেও বিশেষ সাহায্য হইবে বলিয়া মনে করি। গ্রন্থকার নিজের পরীক্ষিত বহু ঔষধ লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ রোগীর মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

উচ্ছ্বাস—উড়িষ্যাবাসিনী কুমারী শ্রীমতী কুন্তলা কুমারী সাবত এল-এম-পি প্রণীত। উড়িষ্যাভাষায় লিখিত একখানি কবিতা পুস্তক। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর বল বি-এ বি-টি মহাশয় লিখিত ভূমিকাসম্ব-লিত। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী আকারের ৬৬+ ৷৹ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৷৹ আট আনা মাত্র। কটক উৎকল সাহিত্য-প্রেস হইতে বিশ্বনাথ কর দ্বারা মুদ্রিত ও কট-কের প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

পুস্তকটী ছয়টী প্রাকৃতিক কবিতার সমষ্টি। উহাদের নাম যথাক্রমে—'শেফালি প্রতি', 'চন্দ্র প্রতি', 'কামিনী (কামিনীকুসুম) প্রতি', 'কমল প্রতি', 'তারা প্রতি' ও 'সহকার প্রতি'। প্রত্যেকটী কবিতাই উচ্ছ্বাসের এক-একটী তরঙ্গ। কবিতাগুলিতে লেখিকার প্রকৃত হৃদয়োচ্ছ্বাসই ধ্বনিত হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্য দিয়া সেই অসীমপুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি-চেষ্টাই লেখিকার বিশেষত্ব। কবিতাগুলির সুযোগ্য ছন্দ নির্ব্বাচন তাঁহার কৃতিত্বের আর একটী অঙ্গ। শেফালি শরতের প্রতীক; 'শেফালি প্রতি' কবিতাটী পাঠে বাস্তবিকই শরতের ভাব চিত্তে উঁকি মারিয়া যায়। শেফালি নিভৃতে বিকশিত হইয়া সৌরভ দান করে—প্রভাতে ঝরিয়া যায়; লেখিকা শেফালির সহিত আপনার আত্মার তুলনা করিয়া কহিয়াছেন :—

শেফালি,

মো জীবন শেষকালে পড়িবি তো মু ঝরি
তোলি নেব নাহি কি সে মোতে যত্নে আহরি
মোর আত্মা-ফুলচারু চরণে দলিবা ঠাকু
তারি প্রিয় নিকেতন সজাইব নেই সে
তোষিব প্রাণটী মোর কেতে প্রেম দেইসে॥

কি ব্যাকুলতা—কি সুন্দর ভাব-ব্যঞ্জনা! অনেকগুলি কবিতার ভাব, ভাষা ও কবিত্ব বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

যথাযোগ্য উপমানির্ব্বাচনও লেখিকার কৃতিত্বের আর একটী দিক্। প্রবাললিপ্ত স্ফটিকের সহিত সেফালির উপমা বাস্তবিকই সুন্দর। সকল স্থানে কবিতাগুলিতে ভাবের মৌলিকতা রক্ষিত না হইলেও সৌন্দর্য্যের অভাব হয় নাই। তবে বোধ হয়, কবিতাগুলি আর একটু সংক্ষিপ্ত ও সংহত আকারের হইলে ভাবের গভীরতা ও মধুরতা আরও বৃদ্ধি পাইত। দুই-এক স্থানে কবিতার মিলও একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, যেমন— 'মোর'এর সহিত 'ধারের'; 'চিহ্ন'এর সহিত 'ক্ষীণের' ইত্যাদি। কিন্তু আমরা জানি, উৎকল ও বঙ্গদেশের প্রাচীন কবিতায় এবিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট নজির আছে। মোটের উপর আমরা বলিতে পারি, কবিতাগুলিতে গুণের ভাগই অধিক। স্থানে স্থানে ভাব, ভাষা ও ছন্দের এমন সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। বঙ্গদেশ অপেক্ষা উৎকলে নারী লেখকের সংখ্যা অতি কম; এইজন্য আমরা লেখিকার এই উদ্যমকে প্রশংসা করিতেছি এবং তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি তিনি এইরূপ অকৃত্রিম সাহিত্যসেবার দ্বারা উৎকলভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবেন এবং উৎকলের প্রাচীন গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সহায়তা করিবেন। আমরা তাঁহার নিকট যথেষ্ট আশা করি।

আয়-ব্যয়।

১৮৪৫ শক আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯০৪৭॥৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৩॥৬
সমষ্টি	৯০৬১৵৬
ব্যয়	৯০৫৯।/৬
স্থিত	১৸০

আয় ১৮৪৫ শক ব্রাহ্মসমাজ।

বাৎসরিক দান	১৫৲
এককালীন দান	২০৲
মাসিক দান	১৯০০৲
আনুষ্ঠানিক দান	৫০৲
মাঘোৎসবের দান	২১৲
বণ্ডেড ওয়ারহাউস	১১৫৲
হাওলাত জমা	৮৲
গচ্ছিত আদায়	৩৮২৮৵০
সমষ্টি	৫৯৪৭৵০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	১১০৮॥৶০
কাগজের মূল্য	১৪২৩।/০
দপ্তরী	১৮৲
সমষ্টি	২৫৫০৲

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৮৮৵০
অপরের পুস্তক	৩৩॥৵০
মাশুল	৬।/০
সমষ্টি	১২৮/০

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া মূল্য	৫৪৲
হাল মূল্য	৪৫৲
নগদ মূল্য	॥০
অগ্রিম মূল্য	১॥০
বিজ্ঞাপন	৩০৫৲
মাশুল	৬।৶০
সমষ্টি	৪২২।৶০

মোট আয়	৯০৪৭॥৵০

ব্যয় ১৮৪৫ শক ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	১০০৲
গায়ক	১৫০৲
কার্য্যাধ্যক্ষ	১৪২॥০
বেহারা	১৪৪৲
মেথর	২২।৬
ইলেকট্রীক	৭০॥৶৬
ট্যাক্স (মিউনিসিপ্যাল)	২৩৬।৵০
লাইসেন্স	১২৲
কেরসিন	৮৸৶০
পাথাকুলী	১॥৵০
মাঘোৎসব	৩৩৸/০
সরঞ্জামী	৯॥৶৩
গচ্ছিত খরচ	৪৩৩৫॥৵০

হাওলাত শোধ	৮৲
পুরস্কার	৩॥/৬
পার্ব্বণী	২৲
ডাকমাশুল	৪২৸৶০
পাইখানা	১৸০
বিবিধ	৮৯৸/৯
আসবাব	১০৶০
তামাক-টিকে	২।/৬
বারবরদারী	১৪॥/৩
পূর্ত্তকার্য্য	৬৪।৶৯
মেডিকেল মিশন	১৫॥/০
Trust deed	৪৮৸৯
কাগজ ক্রয়	৮৸৬
সসপেন্স	১২৲
সমষ্টি	৫৫৯০।৶৩

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	২৬৪৲
কম্পোজিটর	৪৮৯৵৩
প্রেসম্যান	২০৮৶৩
ইঙ্কম্যান	১৭৪৶৩
কাগজতোলা	৬৭৸৯
কার্য্যাধ্যক্ষ	১২২॥০
প্রেসের কালি	৩৫৲
অক্ষর ক্রয়	৪৩৮৶৭
খুরা ক্রস	২॥৶০
রুলঢালা	৪॥৵৩
সাজিমাটী	৪।৵৭
শিরিষ	৮।৶০
দপ্তরী	৮৩৲
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১৯৩৮৶৬
ছাপার কাগজ (অপরের)	১১৬৭॥৵৬
প্রেসের তৈল	৬॥৩
তামাক-টিকা	৪।৶০
জলপানি	২৪/০
বাতি	৩।৶৯
মাশুল	৩৸৬
মুটে	১৯৻৩
দড়ি	৶০
লেই	১॥৬
বিবিধ	১৫॥৶০
গীতা মুদ্রণ	৩১॥০
সমষ্টি	২৯৭৭০

ব্যয় ১৮৪৫ শক পুস্তকালয়।

গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	১৫৸০
পুস্তক ক্রয়	৩।৵৬
সমাজের পুস্তকের কমিসন	১২৸৶৩
সমাজের পুস্তক বাধাই	৪॥০
মাশুল	২২॥৬
অন্যান্য	৶০
সমষ্টি	৫৯।/৩

ব্যয় ১৮৪৫ শক তত্ত্ববোধিনী।

কাগজ	১২৪৸০
প্রবন্ধ	৭৲
কার্য্যাধ্যক্ষের বেতন	১২৫৲
বিজ্ঞাপন	৶৬
বিজ্ঞাপনের কমিশন	৫৯৸৭
মাশুল	৬৩৲
বাধানো	৫২।৵৬
অন্যান্য	৶০
সমষ্টি	৪৩২।/০
মোট ব্যয়	৯০৫৯।৶৬

নিবেদন।

গ্রাহকগণের প্রতি।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইলে তাঁহাকে সেই বৎসরের ১ম সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩৶৹ আনা ; প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৹ চারি আনা। ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র। অসমর্থ, ছাত্র এবং মহিলাদের জন্য বার্ষিক মূল্য ২৶৹।

৩। প্রতি মাসের সাধারণত প্রথম সপ্তাহেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গ্রাহকগণ প্রতি মাসের শেষ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে তদন্ত করিবেন ; না পাইলে ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিবেন। যে মাসের পত্রিকা, সেই মাস অতীত হইলে অপ্রাপ্ত সংখ্যা বিনামূল্যে দেওয়া হইবে না।

৪। বিনামূল্যে নমুনা-স্বরূপ পত্রিকা দেওয়া হয় না। তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইলে নমুনা একখণ্ড পাঠান হয়।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয়। অতিরিক্ত খরচ ।৹ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। অল্পদিনের জন্য ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ডাকঘরের সহিত বন্দোবস্ত করাই সুবিধা।

লেখকগণের প্রতি।

৭। লেখকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রবন্ধের নকল রাখিয়া পাঠাইবেন।

৮। উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া থাকিলে রচনা মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি।

৯। বিজ্ঞাপনের মূল্য মাসে মাসে অগ্রিম দেয়।

১০। বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে। শেষ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর পনেরো দিনের মধ্যে ব্লক ফেরত না লইলে উহা হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

১১। অশ্লীল প্রভৃতি বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। বর্জ্জাইস অক্ষরে বিজ্ঞাপন ছাপি না। ছাপিতে হইলে সাধারণ দর অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে তজ্জন্য আমরা দায়ী নহি।

১২। সমস্ত বিজ্ঞাপনই সাধারণতঃ স্মলপাইকায় ছাপা হয়। হেডিং প্রভৃতিতে মানানসই অক্ষর ব্যবহৃত হয়।

১৩। বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য :—পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮৲ ; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪॥৹ ; সিকি পৃষ্ঠা ২॥৹ ; সিকি কলম ১॥৹ টাকা।

১৪। বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে বা দীর্ঘকাল প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপনের মূল্য পত্র লিখিলে জানান হয়।

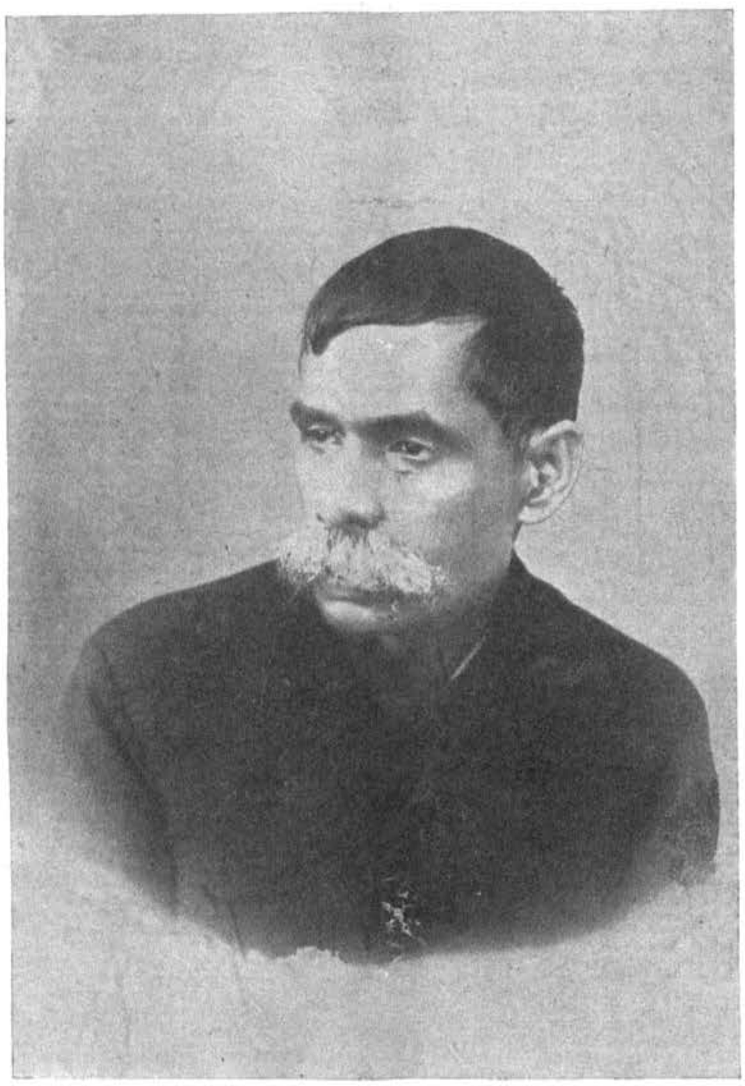
১৫। পত্রিকার মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিময়ের জন্য পত্রিকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

১৬। পত্রিকা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাইবেন।

১৭। পত্রিকার বহুল প্রচারের জন্য এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য এজেন্ট আবশ্যক। আমাদের নিযুক্ত এজেন্টগণ সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধাজনক স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সাক্ষাতে তাহার বিবরণ জানিতে পারিবেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।



উড়িষ্যার ৺রাধানাথ রায় কবিশ্রেষ্ঠ

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৬।

৯৮২ সংখ্যা ১৮৪৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৬। সম্বৎ ১৯৮২। খৃঃ ১৯২৫। শক ১৮৪৭। সাল ১৩৩২।

অঞ্জলি।

৫৬। অঞ্জলি—প্রিয়তম দেবতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। প্রিয়তম! তুমি কোথায়? তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। কে তোমাকে আমার নিকটে আনিয়া দিবে? তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দূরে রহিয়াছ?

২। আকাশ! আমার প্রিয়তমকে তুমি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ, ফিরাইয়া দাও। চন্দ্রসূর্য্য! আমার প্রিয়তমকে যদি দেখিয়া থাক, তবে বলিয়া দাও আমার প্রিয়তম কোথায়? হে গ্রহতারা! আমার নয়নতারাকে তোমরা যদি দেখিয়া থাক, তবে বলিয়া দাও।

৩। প্রিয়তম! তুমিই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তোমাকে হারাইয়া আমার এই জীবনে প্রয়োজন নাই। তোমার চরণে যদি আমার জীবন সমর্পণ করিতেই না পারিলাম, তবে এই তুচ্ছ জীবনে কি প্রয়োজন?

৪। তুমিই আমাদের হৃদয়দেবতা। তুমিই আমাদের সমাজপতি। তুমি আমাদের পাষাণ-হৃদয় বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া বিশুদ্ধ প্রীতি ঢালিয়া কোমল কর।

৫। তুমিই আমাদের সকলের নিয়ন্তা। তুমি আমাদের সকলেরই হৃদয়ে এমন ইচ্ছা ও ক্ষমতা দাও, যাহাতে আমরা সকলেই আমাদের সমাজের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হই।

৬। ব্রাহ্মসমাজ হইতে তোমাকে জানিয়া যে দৈব ঋণ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদের জীবনকে প্রকৃত ব্রাহ্ম জীবনে পরিণত করিয়া সেই ঋণের অন্তত বিন্দু পরিমাণও যেন পরিশোধ করিতে পারি।

৭। আমরা যেন কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রাপ্ত প্রভূত উপকার স্মরণ করিয়া তাহার পর্ব্বতসমান গুরুভার বহন করিতে যত্নশীল হই।

৮। আমরা অতি দুর্ব্বল! তুমিই দুর্ব্বলের একমাত্র বল। তুমি আমাদের শুভ সংকল্পে বল প্রদান কর। সেই সংকল্প সংসাধনের জন্য আমাদের শরীর, মন ও আত্মাতে উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য প্রদান কর।

৫৭। অঞ্জলি—বৎসরাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

১। আজ বৎসরের শেষ দিবস। আজ পুরাতন বৎসর অতীতের শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত। নূতন বৎসরের জন্মদান করিয়া আজ পুরাতন বৎসর আপনার সুখ-দুঃখের সহিত বিলুপ্ত হইতে চলিল। তাই হে সম্বৎসরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! তোমার নিকটে আমরা সাশ্রু নয়নে উপস্থিত হইয়াছি।

২। আমরা জানি যে, আমাদের জীবন সুখে

দুঃখে গঠিত, হর্ষ ও শোকের বিচিত্র উপাদানে বিরচিত, সম্পদে ও বিপদে লালিত-পালিত। কিন্তু আজ পুরাতন বৎসরের সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সুখ, হর্ষ, সম্পদ, সকলই ভুলিয়া গিয়াছি; কেবল দুঃখশোক হৃদয়ে অবিরল ক্রন্দন-ধ্বনি জাগাইতেছে।

৩। সম্বৎসরের সন্ধ্যাকালে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, আমাদের চারিপার্শ্বে মৃত্যুপাশ কত প্রকারে জড়াইয়া আসিতেছে। হাস্য-পরিহাসের পরিবর্ত্তে বিবেক ও বৈরাগ্যে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরকালের ভীষণ রহস্যময় ভাব অন্তরে সবেগে আঘাত করিতেছে।

৪। একটী সুদীর্ঘ বৎসর বৃথায় কাটাইয়াছি। বৎসরের প্রারম্ভে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সংসারে প্রেম-শান্তি ঢালিয়া দিব। সে ইচ্ছা, সে সংকল্প কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। সংসারে মরুভূমির উত্তপ্ত বালু আনিয়া ঢালিয়া দিয়াছি।

৫। হে পিতা! বৎসরের প্রারম্ভে তুমি আমাদিগকে অমৃত দিয়াছিলে; বৎসরের শেষে আমরা অমৃতের পরিবর্ত্তে মৃত্যু আনিয়াছি। তুমি আমাদিগকে জ্যোতি দিয়াছিলে; জ্যোতির পরিবর্ত্তে আমরা আপনাদিগকে অন্ধকারে নিমগ্ন রাখিয়াছি। তুমি আমাদিগকে পুণ্য দিয়াছিলে, পুণ্যের পরিবর্ত্তে পাপ আনিয়াছি।

৬। আমরা সমুদয় হারাইয়াছি, তথাপি আমাদের এখনও চেতনা হয় নাই। আমরা দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তবু কি যে অসাড়তা আমাদিগকে অধিকার করিয়াছে, আমরা তাহার প্রতীকারের চেষ্টাই করিতেছি না। তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি সখা, তুমিই তপ্ত হৃদয়ের শান্তিবারি। শত শত শারীরিক ব্যাধির জন্য তুমি ঔষধ প্রস্তুত রাখিয়াছ; তুমি পাপযন্ত্রণার জন্যও নিশ্চয়ই ঔষধ রাখিয়াছ।

৭। সেই ঔষধ অনুতাপ। তুমি আমাদের দয়াময় পিতা, করুণাময়ী মাতা। আজ পাপতাপে বিখণ্ডিত, অনুতাপের অনলে দগ্ধ হৃদয় লইয়া আমরা তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি। তোমাকে ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিয়া বলিতেছি—জননি, আমাকে মার্জ্জনা কর; আমরা শতবার তোমার আদেশের বিরুদ্ধে গিয়াছি। তুমি আমাদিগকে সুপথে আনয়ন কর। তুমি আমাদের হৃদয়ে শান্তিপ্রদান কর।

৮। আমরা জানি, আমাদের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া তুমি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না। এই কঠোর সংসার-অরণ্যে তুমি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া আমাদের লালন-পালনের জন্য আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার প্রতিনিধি পিতামাতার হৃদয়ে কত স্নেহ, কত মমতা, কত ভালবাসা প্রেরণ করিয়াছ।

৯। তুমি আমাদের পিতার পিতা, মাতার মাতা। তুমি আমাদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পার না। তোমাকে যখন কাতরপ্রাণে আমরা ডাকিতেছি, তখন আমাদিগকে তোমার ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেই হইবে। তুমি ভক্তবৎসল। তুমি আপনাকে দিয়া আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ কর।

১০। হে অন্তর্যামী! তোমার চরণপ্রান্তে আজ আমরা পাপতাপে উত্তপ্ত হৃদয় লইয়া আসিয়াছি। তুমি আমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়া তোমার ক্রোড়ে তুলিয়া লও। তুমি সর্ব্বদাই আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত থাক। আমাদিগকে পাপ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা কর। পাপের লেশ হৃদয়ে দেখা দিলে তোমার বজ্রের আঘাতে তাহা দগ্ধ করিয়া দিও। তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া আমাদের সমুদয় বিঘ্ন দূর হউক, আমাদের হৃদয় পবিত্র হউক।

৫৮। অঞ্জলি—বিশ্ববিধাতা দেবতা।

১। হে করুণাময় পরমেশ্বর! এই মহাশূন্যে তোমারই শাসনে চন্দ্রসূর্য্য, দ্যুলোক-ভূলোক অবিরোধে অবস্থিতি করিয়া তোমার অতুলনীয় শক্তির পরিচয় দিতেছে।

২। মনুষ্যসমাজে তোমারই ধর্ম্ম সেতুস্বরূপে যে সংসারকে রক্ষা করিতেছে, সেই সংসারে থাকিয়া আমরা তোমার অনুপম স্নেহ নিত্য অনুভব করিতেছি।

৩। তোমারই প্রসাদে নদীসমুদ্র ধরণীকে শস্যশ্যামল করিয়া আমাদের জীবনরক্ষার উপায়-বিধান করিতেছে।

৪। তোমারই প্রসাদে আমরা পিতামাতা

স্ত্রীপুত্র, ভাই-ভগ্নী, সকলের সুকোমল প্রেম নিত্য নূতনভাবে অনুভব করিতেছি।

৫। তোমারই প্রসাদে প্রত্যেক শুভ কার্য্যে, প্রত্যেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে তোমার অনুপম আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া কত আনন্দিত হইতেছি।

৬। হে পরমাত্মন্! আমরা দুর্ব্বল ভ্রান্ত-জীব। তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর। তোমার জ্ঞানালোকে প্রেমালোকে আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার চূর্ণ করিয়া দাও।

সংগ্রামে আহ্বান।

(নববর্ষে উপদেশ)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

জীবনমরণের ভিতর দিয়া, সুখদুঃখ বিপদসম্পদের ভিতর দিয়া আজ আমরা জীবনমরণের নিয়ন্তা, বিপদসম্পদের বিধাতা অন্তর্যামী ভগবানের তাঁহার চরণে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

আমাদের জীবনে এই প্রকারই তাঁহার আশীর্ব্বাদ কত বার ভিক্ষা করিয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হই, কিন্তু হায়! তাঁহার আশীর্ব্বাদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি না। কতবার প্রতিজ্ঞা করি, তাঁহার সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ সার্থক করিব, সকল কর্ম্মে তাঁহার আদেশবাণী শুনিয়া তাঁহারই প্রবর্ত্তিত পথে চলিব, সকল অনুষ্ঠানে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথম আসন প্রদান করিব; কতবার স্থির করি, বিপথে চলিব না, বিষয়বাসনার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া এই দুর্লভ মানবজন্মকে নিস্ফল ও ব্যর্থ করিব না, যাঁহা হইতে এই মানবজন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানে ধর্ম্মে ও প্রীতিতে অনন্ত উন্নতির পথে চলিবার অধিকার লাভ করিয়াছি, সংসারের সজনতার মধ্যেই হৌক, অথবা গিরিগুহার নির্জ্জনতার মধ্যেই হৌক, তাঁহারই সন্ধানে বহির্গত হইব; ধ্যানস্থ হইয়া প্রকৃতির ভিতরে প্রকৃতির নিয়ন্তা বিশ্ববিধাতার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইব এবং আত্মার অন্তরে অন্তর্যামী পরম দেবতার সংস্পর্শ লাভ করিব; কতবার মনে করি, তাঁহার পবিত্র নামের জয়ধ্বনি করিয়া জগতবাসীকে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আহ্বান করিব, বন্ধুবান্ধবে মিলিত হইয়া সংসারের শতবিধ প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু আমরা প্রত্যেকে আমাদের অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি করিব যে, সে প্রতিজ্ঞা আমরা সম্যক্ রক্ষা করিতে পারি নাই; ভুলভ্রান্তিতে, ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত পাপেতাপে জীবনের অনেক অংশই কাটিয়া গিয়াছে।

জীবনের অনেক অংশ কাটিয়া গিয়াছে—গিয়াছে। তাহার জন্য হাহুতাশে বিলাপ-ক্রন্দনে জীবনের অবশিষ্ট অংশকে ব্যর্থ করিবার অবসর নাই। আমরা অপূর্ণ। জানি না, কেন, কি প্রকারে—কিন্তু ইহা জানি যে ভগবানেরই মঙ্গলবিধানে আমরা সর্ব্ববিষয়ে অপূর্ণতা লইয়াই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের পদে পদে ভুলভ্রান্তি তো হওয়াই সম্ভব। ভুলভ্রান্তি না করিলে, পাপেতাপে সময়ে অসময়ে ক্ষতবিক্ষত না হইলে আমরা তো দেবতা কেন, স্বয়ং ভগবানই হইয়া যাইতাম। আমরা যখন অপূর্ণ, তখন ভুলভ্রান্তির জন্য, পাপতাপের জন্য বৃথা হাহুতাশ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই; কিন্তু ভুলভ্রান্তির সঙ্গে পাপতাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহার উপরে উঠিবার চেষ্টা শতবার করিতে হইবে। সেই অপরাজিত বিশ্বেশ্বরের অজেয় পতাকাতলে দণ্ডায়মান হইয়া এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়লাভ করিবার জন্য আজ আমরা বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলকে আহ্বান করিতেছি।

যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছি, এ সংগ্রাম বাহিরের সংগ্রাম নহে। যে সংগ্রামে সহস্র সহস্র লোক অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; যে সংগ্রামে নরহত্যা, হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি লোলজিহ্ব অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি লোকক্ষয়ের শতবিধ কারণ যে সংগ্রামের অপরিহার্য্য নিত্যসহচর, আমাদের এই সংগ্রাম সে সংগ্রাম নহে। যে সংগ্রাম আমাদের অন্তরে দিবানিশি চলিতেছে, যে সংগ্রামে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুর পরিবর্ত্তে জীবন লাভ করিবে, অমরত্ব লাভ করিবে; যে সংগ্রামের ফলে জগত হইতে হিংসাদ্বেষ, বিরোধবিবাদ, অন্যায় অবিচার, অত্যাচার প্রভৃতি নিশ্চয়ই অন্তর্হিত হইবে; যে